কসোভোর স্বাধীনতার সংগ্রাম

(The Independence Movement of Kosovo)

(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য অভিসন্দর্ভ)

GIFT

468252

DIGITIZED

গবেষক
মোঃ হোসাইন আহমেদ শামীম
এম.ফিল. গবেষক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhak University Library
468252

Repository Content

তত্ত্বাবধায়ক
ডক্টর মোহাম্মদ তৌফিকুল হায়দার
অধ্যাপক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ফেব্রুয়ারী, ২০১৫

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

468252

কসোভোর স্বাধীনতার সংগ্রাম

(The Independence Movement of Kosovo)

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

'কসোভোর স্বাধীনতার সংগ্রাম' শীর্ষক গবেষণা-কর্মটি কসোভোর নিজস্ব এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরূত্বপূর্ণ অধ্যায়। এ গুরূত্বপূর্ণ গবেষণা কর্মে আমার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান ও অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ তৌফিকুল হায়দার, যিনি কসোভোসহ আধুনিক মুসলিম বিশ্বের ইতিহাস বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। এ গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে তিনি আমার জন্য শ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন, সময়ে অসময়ে আমার বিরক্তকে অসামান্য মমতা দিয়ে সহ্য করেছেন। গবেষণার একেবারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর আন্তরিক সহযোগিতা,উৎসাহ, অনুপ্রেরণা এবং সুচিন্তিত পরামর্শ ও দিক নির্দেশনায় এ গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন হয়েছে। যার কোন তুলনা হয় না। গবেষণা কর্মটি সম্পাদনের জন্য তিনি তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে গ্রন্থ ও জার্নাল দিয়েও আমাকে সহায়তা করেছেন। 468253

এ সকল কারণে আমি তাঁর নিকট চির কৃতজ্ঞ ও ঋণী। তার এ ঋণ আমি কোন দিন শোধ করতে পারব না। ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ যাঁরা আমাকে পরামর্শ ও উৎসাহ দিয়েছেন তাদের সকলের নিকট আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা পোষণ করছি আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক ও বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো: মাহ্ফুজুল ইসলামকে, যিনি এম.ফিল. জমাদান পর্যায়ে সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে প্রকৃত অর্থে সহযোগিতা করেছেন।

আমার এ গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করার জন্য বিভাগের যে সকল শিক্ষক ও কর্মকর্তাবৃন্দ আমাকে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন তাঁরা হলেন অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ ইব্রাহিম, কলা অনুষদের মাননীয় ডীন অধ্যাপক ড. মো: আখতারুজ্জামান, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান, জনাব আবুল কালাম আজাদ, ডক্টর মো: সাইফুলাহ, জনাব মো: ওমর ফারুক, জনাব এ, কে, এম, ইফতেখারুল ইসলাম, জনাব মাহ্মুদুর রহমান, জনাব কবির আহম্মেদ, জনাব সারোয়ার হোসেন ও জনাব মোঃ মজিবুর রহমান, তাঁদের সকলের নিকট আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

আমার এ গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করার জন্য যে সকল গবেষক, লেখক এবং প্রবন্ধকারের লেখা থেকে সাহায্য নেয়া হয়েছে তাদের প্রত্যেকের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। আমার গবেষণা কর্মের জন্য বিভিন্ন লাইব্রেরী ব্যবহার করতে হয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, ঢাকাস্থ বেশ কয়েকটি মুসলিম রাষ্ট্রের দূতাবাস লাইব্রেরী, ন্যাশনাল আর্কাইভস লাইব্রেরী, বাংলা একাডেমী লাইব্রেরী, জাতীয় সংসদ ভবন লাইব্রেরী, বেগম সুফিয়া কামাল গণগ্রন্থাগার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এ সকল প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের আন্তরিক সহযোগিতার জন্য তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পরিশেষে যাদের কথা না বললেই নয় তারা হলেন আমার শ্রদ্ধেয় পিতা-মাতা ও ভাই-বোন যারা আমাকে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন এবং কাজটি করতে গিয়ে আমি তাদের যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে পারিনি। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য নূরুন্নাহার ভূঁইয়া রিতা আপার কথা যার আন্তরিক সহযোগিতা না থাকলে আমার পক্ষে কাজটি করা ছিল অত্যন্ত দুরূহ। আমি বিশেষ ভাবে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আমার টুইন বেবী মিফতাহুল জান্নাত হোসাইন ও আরূফা তানজিবা হোসাইন এর প্রতি। কেননা এ গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে গিয়ে আমি তাদের প্রতি সঠিক যত্নবান হতে পারিনি। এ ছাড়া আমার অভিসন্দর্ভটি যিনি তৈরি, গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা ও জমাদানের সকল পর্যায়ে সার্বিকভাবে সহায়তা করেছেন তিনি হলেন আমার সহধর্মিণী জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব আনোয়ারা আক্তার; আমি তাঁকে জানাচ্ছি অশেষ ধন্যবাদ।

মোঃ হোসাইন আহমেদ শামীম
এম.ফিল. গবেষক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ফেব্রুয়ারী, ২০১৫
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অঙ্গীকারনামা

আমি মোঃ হোসাইন আহমেদ শামীম, এম.ফিল. গবেষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এম.ফিল. রেজিঃ নং-২৬/২০০৯-১০, এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, আমার এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত **'কসোভোর স্বাধীনতার সংগ্রাম'** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি ইতোপূর্বে কোন ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করা হয়নি।

(মোঃ হোসাইন আহমেদ শামীম)
এম.ফিল. গবেষক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০
ফোনঃ ৯৬৬১৯০০-৭৩/৬৩৩০

Department of Islamic History & Culture
Univesity of Dhaka
Dhaka-1000
Phone: 9661900-73/6330
E-mail: ishist_du@yahoo.com

তাং...............................

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মোঃ হোসাইন আহমেদ শামীম, এম.ফিল. গবেষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কতৃক এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত ***‘কসোভোর স্বাধীনতার সংগ্রাম’*** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে লিখিত হয়েছে। এটি মোঃ হোসাইন আহমেদ শামীমের একক গবেষণালব্ধ মৌলিক রচনা। আমার জানামতে এই অভিসন্দর্ভটি ইতোপূর্বে কোন ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করা হয়নি। সুতরাং প্রার্থীকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কর্তৃক এম.ফিল. ডিগ্রি প্রদান করার জন্য এটিকে বিবেচনার জোর সুপারিশ করছি।

তত্ত্বাবধায়ক

(ডক্টর মোহাম্মদ তৌফিকুল হায়দার)
অধ্যাপক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
ভূমিকাঃ	১-৮
প্রথম অধ্যায়ঃ	৯-৩৪
ওসমানীয় শাসনামলে কসোভো বিজয়	
দ্বিতীয় অধ্যায়	৩৫-৮৩
পটভূমি ও সাম্প্রতিককালে এর কারণ সমূহ	
আধুনিক ইউরোপের ইতিহাসে কসোভো স্বাধীনতা সংগ্রামের সূত্রপাত	
তৃতীয় অধ্যায়ঃ	৮৪-১০২
কসোভো স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘটনাপ্রবাহ	
বিভিন্ন শক্তিবর্গের ভূমিকা	
চতুর্থ অধ্যায়	১০৩-১১৭
কসোভো স্বাধীনতা সংগ্রামে বিভিন্ন সংগঠনের ভূমিকা	
প্রতিক্রিয়া আলোচনা-সমালোচনা	

পৃষ্ঠা নং

পঞ্চম অধ্যায় ১১৮-১২৫

কসোভো স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফলাফল

আধুনিক বিশ্বে এর প্রভাব

উপসংহার ১২৬-১৩৪

পরিশিষ্ট ১৩৫-১৬৪

পরিশিষ্ট-১ : বলকান অঞ্চলের মানচিত্র

পরিশিষ্ট-২ : কসোভোর মানচিত্র

পরিশিষ্ট-৩ : কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ আলোকচিত্র

পরিশিষ্ট-৪ : বলকান অঞ্চলের রাষ্ট্রসমূহের পতাকা

পরিশিষ্ট-৫ : কসোভোর সংবিধানের মৌলিক বিষয়াবলী

গ্রন্থপুঞ্জি ১৬৫-১৯৬

ভূমিকা

কসোভোর স্বাধীনতার সংগ্রাম

বিশ্ব মানচিত্রে নতুন একটি রাষ্ট্র হিসেবে কসোভোর অভ্যূদয় আকস্মিক কোন ঘটনা নয়। সাম্প্রতিককালের ইতিহাসে প্রায় দুই দশক ধরে 'Burning Question' হিসেবে আলোচিত হয়ে আসছে কসোভোর স্বাধীনতা সংগ্রামের বিষয়টি। দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর ১৭ ফেব্রুয়ারী, ২০০৮ সালে এক ঐতিহাসিক ঘোষণার মধ্য দিয়ে কসোভো আত্মপ্রকাশ করে একটি স্বাধীন ও সার্বভোম রাষ্ট্র হিসেবে।[১] বর্তমানে কসোভোর আয়তন ১০ হাজার ৭৮০ বর্গ কিলোমিটার। লোকসংখ্যা ২০ লাখের মত। এর মধ্যে ৯০ ভাগই হচ্ছে আলবেনীয় মুসলিম। বাকিরা সার্ব এবং ক্রোয়েট। সার্বরা মূলত স্লাভিক বংশোদ্ভূত এবং ধর্মীয়ভাবে অর্থোডক্স খ্রিস্টান। কসোভোর সাথে সীমান্ত রয়েছে আলবেনিয়ার। ফলে যুগ যুগ ধরে আলবেনিয়ার মুসলমানরা এ অঞ্চলে এসেছে, বসবাস করছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, আলবেনিয়ার মুসলমানরাই একদিন কসোভোতে বসতি গড়েছিল। এর একদিকে রয়েছে মন্টিনিগ্রো, অপর দিকে রয়েছে মেসিডোনিয়া। সার্বিয়ার সাথেও রয়েছে কসোভোর সীমান্ত।

১২৮৮ খ্রী: মতান্তরে ১২৯৯ সালে আনাতুলিয়াকে কেন্দ্রকরে যে, অটোমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে তার কিছু দিনের মধ্যে এটা একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্যে পরিনত হয় এবং ইউরোপে সাম্রাজ্য বিস্তার শুরু করে। ওসমানীয় সুলতান প্রথম মুরাদের সময়ে তাঁর পুত্র বায়েজীদের নেতৃত্বে ১৩৮৯ খ্রিষ্টাব্দে সার্বিয়া বাহিনীকে পরাজিত করে ওসমানীয়রা কসোভোকে তাদের সাম্রাজ্যর্ভূক্ত করে। মূলত: তখন থেকেই এই অঞ্চলে ইসলামের প্রসার ঘটতে থাকে।[২] উল্লেখ্য চর্তুদশ শতাব্দীতে বুলগেরিয়া (১৩৯৬) দখলের মাধ্যমে ওসমানীয় সুলতানরা বলকান অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে এ অঞ্চলে তাদের প্রভাব কমতে থাকে এবং বলকান অঞ্চলের জাতিগুলো জাতীয়তাবোধে উজ্জীবিত হয়ে স্বাধীনতা লাভে উৎসাহী হয়। এরই ফলশ্রুতিতে একে একে বলকান অঞ্চলগুলো ওসমানীয়দের অধীন থেকে মুক্ত হতে থাকে। ১৮৭৬ সালে সার্বিয়া অটোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে অটোমানরা পাল্টা আক্রমণ

করে। রাশিয়ার হস্তক্ষেপে সার্বিয়া এ যাত্রা রক্ষা পায়। ১৮৭৭ সালে রাশিয়া অটোমান সাম্রাজ্য আক্রমণ করলে সানস্টিফানো চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৮৭৮ সালে বার্লিন কংগ্রেসের মাধ্যমে অটোমান সাম্রাজ্যের অনুপস্থিতিতে সার্বিয়া স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। পরবর্তীতে ১৯১৩ সালের দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধে সার্বিয়া কসোভো দখল করে নেয়। ১৯১৮ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর কসোভো সার্বিয়ার সাথে যুক্ত হয়। ১৯৪৬ সালে কসোভো স্বায়ত্ত্বশাসন লাভ করে এবং ১৯৮৯ সালে এই স্বায়ত্ত্বশাসনের অধিকার হারায়।

১৯৯৯ সালের পর থেকে কসোভো শুধু কাগজে-কলমে সার্বিয়ার অধীনে ছিল। কারণ ১৯৯৯ সালে ন্যাটোর ১৬ হাজার ও জাতিসংঘের দুই হাজার সেনা সেখানে মোতায়েন ছিল এবং দেশটি পরিচালিত হয়ে আসছিল জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত '১২৪৪' নং প্রস্তাব এর অধীনে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে মার্শাল টিটোর নেতৃত্বে যুগোস্লাভিয়া ফেডারেশন গড়ে উঠেছিল, শেষ পর্যন্ত ঐক্যের বন্ধন ভাঙ্গতে শুরু করে ১৯৯১ সালে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাওয়ার মধ্যদিয়ে এবং যার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে ইউরোপের বলকান অঞ্চলে। ফলে স্লোভেনিয়া, মেসিডোনিয়া ও মন্টিনিগ্রো স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং কোন প্রকার রক্তপাত ছাড়াই স্বাধীন হয়ে যায়। এর পরে খন্ডিত যুগোস্লাভিয়ার মধ্যে থাকে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাকারী সার্বিয়া, ক্রোয়েশিয়া ও বসনিয়া-হারজেগোভিনা। কিন্তু মুসলিম প্রধান বসনিয়া, ক্যাথলিক খ্রিস্টান ক্রোয়েশিয়া আলাদা হতে চায়। এ সময় সার্বিয়া আক্রমণ করে ক্রোয়েশিয়াকে এবং সার্বিয় বাহিনীর সাথে যোগদেয় দেশ দু'টিতে বসবাসকারী সংখ্যালঘু সার্বরা। সার্ব নেতা স্লোভেদান মিলোসেভিচ ছিলেন একজন উগ্রজাতীয়তাবাদী নেতা। বলকান মুসলমানদের প্রতি তার বিরুপনীতি ও নৃশংস কর্মকান্ডের জন্য ইতিহাসে তিনি 'Balkan butcher'হিসেবে পরিচিত।[৩] তার নির্দেশে হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট, অগ্নিসংযোগসহ এমন কোন অপরাধ নেই যা বসনিয়া ও ক্রোয়েশিয়ায় সার্বরা করেনি। বসনিয়ায় অত্যাচার হয় বেশি।

আলিয়াইজেত বেগোভিচের নেতৃত্বে বসনিয়া আবার উঠে দাঁড়াতে শুরু করে। এরপর সার্বিয়ার একপ্রান্তে ছোট্ট এলাকা কসোভোর মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার স্বপ্ন জেগে ওঠে। সার্ব নেতাদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে ১৯৯৮ সালে কসোভো স্বাধীনতা দাবি করে। সংগ্রামী নেতা হাশিম থাচির নেতৃত্বে গড়ে ওঠে কসোভো লিবারেশন আর্মি (KLA)। সাধারণ নির্বাচনে হাশিম থাচির দল বিজয়ী হলেও সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেয়ে আজিম শেকুরের সাথে কোয়ালিশন সরকার গঠন করে দেশটির স্বাধীনতা অর্জনে সচেষ্ট হয়। স্বাধীনতার ঘোষণায় সেনাবাহিনী কসোভোয় হত্যাযজ্ঞ শুরু করলে (KLA) প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু করে। এক বছরে সার্ব বাহিনীর হাতে কসোভোর প্রায় ১০ হাজার মানুষ নিহত হয়। ধবংস হয় বড় বড় সরকারী-বেসরকারী ভবন, সেতু, মসজিদ ও রাস্তাঘাট। শেষ পর্যন্ত ১৯৯৯ সালে দেশটির উপর হস্তক্ষেপ করে ন্যাটো ও জাতিসংঘ বাহিনী।

ন্যাটো বাহিনী KFOR বা কসোভো ফোর্স গঠন করে এর মাধ্যমে কসোভো স্বাধীনতা সংগ্রামে কসোভোর অধিবাসীদের সহায়তা করে। ন্যাটো সেনারা সার্বদের উপর বিমান হামলা চালালে সার্বরা কসোভো ছেড়ে চলে যায়। NATO ভূক্ত ২৮টি দেশের মধ্যে ২৪টি দেশই কসোভোকে স্বীকৃতি দেয়। ন্যাটোর মত আরো কতিপয় আন্তর্জাতিক সংস্থাও কসোভোর স্বাধীনতার সংগ্রামকে অনুপ্রাণিত করেছিল। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে United Nations, EU, OIC ইত্যাদি। ২০০৫ সালে ফিনল্যান্ডের সাবেক প্রেসিডেন্ট আহতিশারীকে দায়িত্ব দেয়া হয় আলোচ্য বিষয়টি সমাধানের জন্য। তিনি জাতিসংঘের একটা পরিকল্পনা প্রদান করেন যাকে “আহতিশারী প্লান” বলে এবং জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত ১২৪৪ নং রেজুলেশন অনুযায়ী বর্তমান স্বাধীনতার কার্যক্রম শুরু হয়।[৪]

১৯৯০ সালে কসোভো প্রথম স্বাধীনতা ঘোষণা করলে আর্ন্তজাতিক সম্প্রদায়ের স্বীকৃতির অভাবে তা ভেস্তে যায়। কেননা শুধু মাত্র আলবেনিয়া ছাড়া অন্য কোন দেশ তাদের স্বীকৃতি দেয়নি। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৯ সালে কসোভো দ্বিতীয় বার স্বাধীনতা ঘোষণা করলে সার্ব বাহিনী

তাদের উপর চালায় অমানবিক নির্যাতন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাতিসংঘ, ন্যাটো ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের আনুষ্ঠানিক উদ্যেগে স্লোভেদান মিলোসেভিচের কসোভো আগ্রাসন শেষ হয়েছিল। EU এর ২৭ টি দেশের মধ্যে ২২ টি দেশ কসোভোকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। মুসলিম বিশ্বের অন্যতম সংগঠন OIC এর ভূমিকা যেরূপ হওয়া উচিত ছিল তা হয়নি, উক্ত সংগঠনটি শুধুমাত্র স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে তাদের দায়িত্ব শেষ করে।

কসোভোর স্বাধীনতা সংগ্রামে আর্ন্তজাতিক অঙ্গনে মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। যুক্তরাজ্য, জার্মানী ও ইতালি স্বাধীন কসোভোকে স্বীকৃতি দানে সচেষ্ট থাকলেও গ্রিস, স্পেন, স্লোভেনিয়া ও বুলগেরিয়া তা থেকে বিরত থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কসোভোর পক্ষাবলম্বন করলেও রাশিয়ান ব্লক তার বিরুদ্ধাচারণ করে। পক্ষে বিপক্ষে নানা মত, অবস্থানের প্রেক্ষাপটে এটা সত্য যে, সকল পরাশক্তির ষড়যন্ত্রকে উপেক্ষা করে ইউরোপের বুকে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে কসোভোর আবির্ভাব ঘটে।

আলোচ্য বিষয়টি সংক্রান্ত সকল তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা স্থান পাবে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কসোভোর স্বাধীনতা সংগ্রামের উপর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ এই গবেষণায় অর্ন্তভূক্ত হবে এবং গবেষণার ক্ষেত্রে 'Diacronic' and 'Syncronic'পদ্ধতি (Methodology) অনুসৃত হবে। এক্ষেত্রে লিখিত ঐতিহাসিক (Historical) উপাদান, ইতিহাস গ্রন্থ, সাহিত্যিক রচনা, দলিল-দস্তাবেজ ও আধুনিক প্রযুক্তি ইন্টারনেট প্রভৃতি থেকে তথ্য-উপাত্তের মাধ্যমে অভিসন্দর্ভটি রচিত হয়েছে। নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে তথ্য সংগ্রহকরা হয়েছে:-

ক. বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় গণ গ্রন্থাগার

খ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার

গ. বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার

ঘ. সেমিনার লাইব্রেরী, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঙ. বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগার, ঢাকা

চ. সেমিনার লাইব্রেরী, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এবং

ছ. ইসলামী ফাউন্ডেশন গ্রন্থাগার, বাইতুল মোকারম, ঢাকা

'কসোভোর স্বাধীনতার সংগ্রাম' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি মোট পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে সংশ্লিষ্ট অধ্যায় সর্ম্পকে নতুন তথ্যের অবতরণ করা হয়েছে। আলোচ্য অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে ওসমানীয় খেলাফতের সময়কাল থেকে শুরু করে আধুনিক ইতিহাসের সময়কাল পর্যন্ত প্রথম ও দ্বিতীয় কসোভোর যুদ্ধসহ কসোভোর স্বাধীনতার সংগ্রামের প্রেক্ষাপট ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী ধারাবাহিক ভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে কসোভোর স্বাধীনতার সংগ্রামের সূত্রপাত, পেছনের ইতিহাস এবং সাম্প্রতিক কালে এর কারণ সমূহ বিশ্লেষণ করা হবে। তৃতীয় অধ্যায়ে কসোভোর স্বাধীনতার সংগ্রামের ঘটনা প্রবাহ এবং এতে বিভিন্ন শক্তিবর্গের অংশগ্রহণ পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং চতুর্থ অধ্যায়ে কসোভোর স্বাধীনতার সংগ্রামে বৃহৎ শক্তি, জাতিসংঘ, ন্যাটো, ওআইসি এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠনের ভূমিকা এবং এর প্রতিক্রিয়া আলোচনা-সমালোচনাসহ স্থান পেয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়টি হল এই অভিসন্দর্ভের শেষ অধ্যায়। আলোচ্য কসোভোর স্বাধীনতার সংগ্রামের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ফলাফল চিহ্নিত করা এবং এর প্রভাব আধুনিক বিশ্বে কিভাবে প্রভাবিত হয়েছে তা ফুটিয়ে তোলা হবে সাথে সাথে স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে এখন পর্যন্ত তাদের বাস্তব অবস্থা ও তাদের পার্লামেন্টারী ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

অভিসন্দর্ভের সর্বশেষে চারটি পরিশিষ্ট রয়েছে। পরিশিষ্ট গুলোর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মানচিত্র, জাতীয় পতাকা, কিছু দূর্লভ ছবি ইত্যাদির অবতারণা করা হয়েছে।

কসোভোর স্বাধীনতার সংগ্রাম কোন পরিস্থিতিতে শুরু হয়েছিল, বলকান অঞ্চলের কসাই স্লোভেদান মিলোসেভিসের মাধ্যমে কসোভোর মুসলমানদের উপর অত্যাচারের স্টীম রোলার ও গনহত্যা, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও দেশের সরাসরি অংশগ্রহণ এবং সারা বিশ্বে এর কি প্রভাব পড়েছে সে সকল বিষয়ে তথ্য অনুসন্ধান চালানো হয়েছে আলোচ্য গবেষণায়। উপরোক্ত বিষয়ের আলোকে পরবর্তী অধ্যায় গুলোতে অভিসন্দর্ভের প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর ব্যাপক আলোচনা, তথ্যমূলক বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়নের প্রয়াস চালানো হয়েছে।

আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে কসোভোর স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনতা লাভের উপর ইংরেজী ভাষায় বেশকিছু গবেষণা কর্ম লক্ষ্যণীয়। কিন্তু বিশেষ করে বাংলা ভাষায় একবিংশ শতাব্দীর এই মাইলফলক বিষয়টির উপর তেমন কোন গবেষণা কাজের নজির দৃশ্যমান নয়। এই ঘাটতি পূরনের লক্ষ্যে বক্ষমান গবেষণামূলক কর্মটি একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা মাত্র।

তথ্য নির্দেশ ও টীকা

১। http://en.www.assembly-kosova.org

২। মোঃ ফায়েকুজ্জামান, 'বসনিয়া হারজেগোভিনা সংকটের প্রেক্ষাপট ও সমাধান', *Rajshahi University Studies*, Part-A, Vol-27, 1999, p.63.

৩। http://en.wikipedia.org/wiki/solbodan, milosevic

৪। ফিনল্যান্ডের সাবেক প্রেসিডেন্ট ও জাতিসংঘের বিশেষ দূত মার্টি আহতিশারি কসোভোর মর্যাদা কি হবে তা নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন তৈরি করেন। এতে সুপারিশ করা হয় কসোভো আপাতত স্বাধীন হবে, তবে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তা আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধানে থাকবে। যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ এবং জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের অধিকাংশ সদস্য এই পরিকল্পনার প্রতি সমর্থন প্রদান করেন।

প্রথম অধ্যায়

ওসমানীয় শাসনামলে কসোভো বিজয়

ওসমানীয় শাসনামলে কসোভো বিজয়

অটোমান তথা ওসমানীয় সাম্রাজ্য[১] ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা এই তিনটি মহাদেশ ব্যাপী বিস্তৃত ছিল এবং এর স্থায়িত্বকাল ছিল প্রায় ৬০০ বৎসর । এই বিশাল সাম্রাজ্যটি ঊনবিংশ থেকে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের[২] সমাপ্তিতে নিকটপ্রাচ্য বা বর্তমান তুরস্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। তুরস্ক পর্যবসিত হয় 'The sick man of Europe' খেতাবে।[৩] এর মূলে ছিল ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের জীঘাংসামূলক আচরণ, প্রাচ্য দেশীয় সমস্যা ও বলকান যুদ্ধ। তুরস্কের অবিসংবাদী নেতা আধুনিক তুরস্কের জনক মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক শুধু অটোমান সালতানাতই নয় খিলাফতকে উচ্ছেদ করে তুরস্ককে একটি আধুনিক প্রগতিশীল রাষ্ট্রের ধাঁচে গড়ে তোলেন। মুসলিম সভ্যতার ইতিহাসে তুরস্কের অবদান ছিল লক্ষ্যণীয়। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দী ছিল বিশ্ব পরিমন্ডলে বিকেন্দ্রীকরণের শতক। সামন্তবাদ থেকে পুঁজিবাদে রূপান্তরের শতক। গোটা ইউরোপ যখন সামন্তবাদ থেকে পুঁজিবাদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ঠিক সেই সময়েই অটোমান সাম্রাজ্য নতুন করে সামন্ত প্রথার প্রর্বতন করছে। যুগের দাবির বিপরীতে এই সামন্ত প্রথার প্রর্বতনই পরবর্তীতে অটোমান সাম্রাজ্যের পতনের দ্বিবিধ কারন হয়ে দেখা দেয়। আলোচ্য অধ্যায়েওসমানীদের পূর্ব পরিচয় এবং এ বিশাল সাম্রাজ্যের প্রায় ৬০০ বৎসরের ইতিহাসে কসোভো বিজয় ইত্যাদির বিস্তারিত আলোচনার প্রয়াস রয়েছে।

ওসমানীয় তুর্কীরা মধ্য এশিয়ার 'ওঘুজ' গোত্রের লোক। এরা গোবি মরুভূমি ও ওরাল পর্বতমালার মধ্যবর্তী বিস্তৃর্ণ অঞ্চলের অধিবাসী। তুর্কী কারা, কোথায় তাদের আদিবাস এমন প্রশ্নের জবাবে বিখ্যাত ঐতিহাসিক Andrew Mango এর উক্তিটি প্রনিধানযোগ্য-

> There are many Turkish and also some non-Turkish historians who consider as Turks all people whose origin can be traced to Central Asia, Siberia and the great northern plains on either side of the Ural Moustains and who speak agglutinative

> languages in which the main roots of the words remain unuttered; refinements of meaning being achieved by the addition of suffixes. If this definition is accepted Finns, Estonians and Hungarians in the west and Mongols in the east (not to mention Huns and other extinct people) are all Turks. But of course they do not consider themselves Turks.[৪]

বার্নার্ড লুইস বলেন যে, ওসমানি তুর্কীদের সরকারি কাগজপত্রে 'তুর্কী' নাম পাওয়া যায় না। তুর্কী বলতে ওসমানীয় তুর্কীগণ আনাতোলিয়ার[৫] অসভ্য গ্রাম্য কৃষকদিগকে বা বর্বর তুর্কোম্যানদিগকে বুঝাত[৬] কোন ওসমানি তুর্কীকে 'তুর্কী' বললে সে নিজেকে অপমানিত মনে করত। এতে করে মনে হয় যে, প্রথমদিকে অশিক্ষিত, অসভ্য, বর্বর জাতীয় মেতৃদিহদিগকে তুর্কী বলা হত। তুরস্কের ওসমানীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছে ওসমান।[৭]

'ওসমান' শব্দের ইংরেজী রূপ 'Osmali'বা 'Ottoman'। ওসমানের পিতামহ সুলায়মান (মৃ. ১২৩১ খ্রি.) মধ্য এশিয়ার 'মাহান' নামক স্থানের একজন ক্ষুদ্র জমিদার (পাদিশাহ) ছিলেন। বেশ কিছুকাল তারা এ অঞ্চলে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত রাখতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু নানা কারণে তারা স্বদেশ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয় এবং বহুদিন যাবৎ ভূ-মধ্যসাগর তীরবর্তী আনাতোলিয়ায় বসবাস করতে থাকে। স্বদেশ ত্যাগকারী এই তুর্কীদের অপর একটি শাখা খোরাসানে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে।[৮]কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে চেঙ্গিস খানের দুর্ধর্ষ মোঙ্গলগণ তুর্কীদের খোরাসান থেকে বিতাড়িত করে। ১২১৯ খ্রিস্টাব্দে ওসমানের পিতামহ সুলাইমান শাহের নেতৃত্বে তুর্কীদের একটি দল মোঙ্গল আক্রমণের বহ্নি শিখা হতে আত্মরক্ষা করার জন্য খোরাসান ত্যাগ করে এশিয়া মাইনরে আশ্রয় গ্রহণ করে। চেঙ্গিস খানের মৃত্যুর পর মোঙ্গল আক্রমণের তীব্রতা প্রশমিত হয়ে আসলে ইতস্তত ভ্রাম্যমান এই তুর্কীগণ স্বদেশ

প্রত্যাবর্তনে মনস্থির করে। কিন্তু তাদের নেতা সোলায়মান শাহ ইউফ্রেটিস নদী অতিক্রম করার সময় নদীতে নিমজ্জিত হয়ে মৃত্যুবরণ করলে সমস্ত ঘটনা ভিন্ন খাতে মোড় নেয়। সেখানে সেলজুক তুর্কীগণ একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে এবং একে রোমের সালতানাত বলা হয়। এবং কোনিয়াকে রাজধানী করা হয়। আলাউদ্দিন নামক এক ক্ষুদ্র তুর্কী শাসক সে সময় কোনিয়ার সুলতান ছিলেন। এই রাজ্যের মর্যাদা প্বার্শবর্তী রাজ্যগুলোর মর্যাদার অনুরূপই ছিল বলে অনুমিত হয়। আলাউদ্দিন ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগে একদিন মোঙ্গল সৈন্য বাহিনীর সাথে আঙ্গোরার নিকটবর্তী এক রণক্ষেত্রে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। মোঙ্গল ফৌজের নিকট তাঁর বাহিনী তৃণখন্ডের মত উড়ে যাচ্ছিল। ঘটনাক্রমে ভাগ্যান্বেষী অরতুগ্রল তাঁর মুষ্টিমেয় অশ্বারোহীসহ ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ভাগ্য বিড়ম্বিত গৃহহারা হলেও যোদ্ধা জাতির সম্মুখ ময়দানে অসম অথচ তুমুল সংগ্রাম দেখে বীর ধমণীর রক্ত নেচে উঠল। সুলতান আলাউদ্দিন যুদ্ধে জয়লাভ করে পরিত্রাতা অরতুগ্রলের প্রতি খুব খুশী হন এবং কৃতজ্ঞতাস্বরূপ জায়গীর হিসেবে তাঁকে একটি জেলা দান করেন। ১২৮৮ সালে সোলায়মানের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দলপতি বা রাজ্যের শাসক নিযুক্ত হন। ১২৫৮ সালে ওসমান সুগুতে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ১৬ বছর বয়সে বিখ্যাত দরবেশ, প্রভাবশালী ও প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তিত্ব শেখ ইদেব আলীর কন্যা বিয়ে করেন।

মূলত ওসমানের মাধ্যমেই ওসমানীয় বংশ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। যে সুগুত থেকে ওসমানীয় বংশের যাত্রা শুরু হয়েছিল তা অল্পদিনের মধ্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে দৈর্ঘ্য ১২০ মাইল ও প্রস্থ ৬০ মাইল সহ আয়তনে ৬০০০ বর্গমাইলে বর্ধিত হয়। তাঁর সময়কালে ব্রুসা শহরও তাঁর হস্তগত হয়। এভাবে এক সময়ের সুগুত কেন্দ্রিক ওসমানীয় বংশ পরিণত হয় বিশাল ওসমানীয় সাম্রাজ্যে।

ওসমানীয় রাজত্বকালে কসোভো বিজয় সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে কসোভোর ভৌগলিক অবস্থান এবং বলকান মুসলমানদের নৃতাত্ত্বিক উৎপত্তি সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা প্রয়োজন। কারন কসোভো ছিল বলকান অঞ্চলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান। 'বলকান' একটি তুর্কী শব্দ যার অর্থ

পাহাড় (Mountain)।[৯] বলকান উপদ্বীপটি ছিল অত্যন্ত পর্বত সংকুল।[১০] বলকান অঞ্চলটি ইউরোপের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। বলকান উপদ্বীপটি ৪৬°১/২ ও ৪০°৫ অক্ষাংশে এবং ১৩°২৩ ও ২৩° ০২ দ্রাঘিমাংসে অবস্থিত।[১১]স্লোভেনিয়া, ক্রোয়েশিয়া, বসনিয়া-হার্জেগোভিনা, সার্বিয়া-মন্টিনিগ্রো (বর্তমান পৃথক দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্র),[১২] মেসিডোনিয়া, আলবেনিয়া, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া ও মোলডোভা নিয়ে বলকান অঞ্চল গঠিত। (দেখুন: পরিশিষ্ট-১; বলকানঅঞ্চলের মানচিত্র)। কিন্তু বলকান উপদ্বীপ বলতে বুঝায় দক্ষিণ -পূর্ব ইউরোপের ঐ অংশকে যা কৃষ্ণসাগর , ইজিয়ান সাগর, ভূ-মধ্যসাগর, আয়োনিয়ান সাগর এবং এ্যাড্রিয়াটিক সাগর দ্বারা আবৃত।[১৩] আবার বলকান রাজ্য বলতে আলবেনিয়া, বুলগেরিয়া, গ্রীস, রুমানিয়া, সাবেক যুগোস্লাভিয়া এবং তুরস্কের পশ্চিমাংশকে (Thrace) বুঝায়।[১৪] তবে আলবেনিয়া, মেসিডোনিয়া, বসনিয়া-হার্জেগোভিনা ও কসোভো বলকান অঞ্চলের মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল।

বলকান অঞ্চলের ভৌগলিক অবস্থান এবং পরবর্তী ইতিহাসে এর প্রভাব বর্ণনা করতে গিয়ে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রবার্ট লী ওলফ যথার্থই বলেছেন, "The position of the Balkan peninsula and structure of its land have always invited outside invasions"[১৫] বলকান রাষ্ট্রগুলো নৃ-তাত্ত্বিক দিক থেকে একটি জটিল অবস্থানে রয়েছে। এখানে প্রায় ৬০ মিলিয়ন লোকের বসবাস।[১৬]এই বিশাল জনগোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে অনেক গুলো নৃ-তাত্ত্বিক জাতি গোষ্ঠী ও ধর্মের লোক। এই নৃ-তাত্ত্বিক জটিলতার কারণেই বলকান অঞ্চলে দীর্ঘদিন থেকে এক ধরণের অস্থিরতা বিরাজ করছিল। বলকান উপদ্বীপের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকার মোট জনসংখ্যা ১৮ মিলিয়নের মধ্যে ৬ মিলিয়ন মুসলিম । অন্যান্য নৃ-তাত্ত্বিক গোষ্ঠীগুলো হল সার্ব, ক্রোট, স্লাভ, আলবেনীয়, বসনিয়াক (Bosniak) ও মেসিডোনীয়।[১৭]

বলকান উপদ্বীপের প্রধান প্রধান Ethnic Group গুলোর একটি পরিসংখ্যান নিম্নে দেওয়া হলঃ-

দেশের নাম	মোট জনসংখ্যা	প্রধান প্রধান ধর্ম %	প্রধান নৃ-তাত্ত্বিক গোষ্ঠী
আলবেনিয়া	৩৫,৬৩,১১২	ইসলাম ৭০%, আলবেনীয় অর্থডোক্স ২০%, রোমান ক্যাথলিক ১০%,	আলবেনীয় ৯৫%, গ্রীক ৩%, অন্যান্য ২%,
বসনিয়া-হার্জেগোভিনা	৪৪,৩০,৪৯৪	ইসলাম ৪০%, অর্থডোক্স ৩১%, রোমান ক্যাথলিক ১৫%, প্রোটেস্ট্যান্ট ৪%	বসনিয়ান ৫০% সার্বিয়ান ৩৬% ক্রোট ১৪%
মেসিডোনিয়া	২০,৭১,২১০	মেসিডোনীয় অর্থডোক্স ৬৭%, ইসলাম ৩০%,	মেসিডোনীয় ৬৭%, আলবেনীয় ২৩%, তুর্কী ৪%,
কসোভো	২০,০০,০০০	আলবেনীয় মুসলিম ৯০%, তুর্কী ১০%, খ্রিঃ ধর্মাবলম্বী সার্ব	আলবেনীয় ২৩%, তুর্কী ৪%, সার্ব ২%
বুলগেরিয়া	৭৫,১৭,৯৭৩	বুলগেরীয় অর্থডোক্স ৮৪%, মুসলিম ১২%,	বুলগেরীয় ৮৪%,
ক্রোয়েশিয়া	৪৪,৯৫,৯০৪	মুসলিম ০%, রোমান ক্যাথলিক	গ্রীকঅর্থডোক্স ৯৮%, অর্থডোক্স ৫%
গ্রীস	১,০৬,৬৮,৩৫৪	গ্রীকঅর্থডোক্স ৯৮%, মুসলিম ১%,	গ্রীক ৯৮%
সার্বিয়া-মন্টিনিগ্রো (বর্তমান পৃথক দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্র)	১,০৮,২৯,১৭৫	অর্থডোক্স ৬৫%, মুসলিম ১৯%, রোমান ক্যাথলিক ৪%	সার্ব ৬৩%, আলবেনীয় ১৭%, মন্টেনিগ্রিয়ান ৩%, হাঙ্গেরিয়ান ১৭%[১৮]

বলকান রাষ্ট্র এবং দক্ষিন-পূর্ব ইউরোপের ইসলামী সম্প্রদায় সাধারণ হানাফি মাজহাবের সুন্নী সম্প্রদায়ভূক্ত। বলকান অঞ্চলের মুসলমানরা মূলত তুর্কী মুসলমানদের থেকে বংশোদ্ভুত। তবে বলকান মুসলমানদের অন্য একটি অংশ যারা মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য জায়গা থেকে ওসমানী শাসন আমলে এখানে এসেছে। বলকান অঞ্চলের সিংহভাগ মুসলমান ধর্মান্তরিত। তবে ধর্মান্তরিত মুসলমানদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী আলবেনিয়া, বসনিয়া-হার্জেগোবিনা ও বুলগেরিয়াতে। বর্তমান আলবেনিয়া ও কসোভো ছাড়া বলকান অঞ্চলের প্রায় সব জায়গাতেই মুসলমানরা সংখ্যালঘু।[১৯]

বলকান অঞ্চলে রয়েছে মুসলিম শাসনের এক সুদীর্ঘ ইতিহাস। মধ্যযুগীয় আলেকজান্ডার নামে খ্যাত প্রথম মুরাদের (১৩৫৯-১৩৮৯) রাজত্ব কালে তুর্কী বাহিনী বলকান পাহাড় পার হয়ে সার্বিয়ার অভ্যন্তরে ঢুকে পড়লে সার্বিয়ার রাজা একটি শান্তি চুক্তিতে উপনীত হন। কিন্তু পরবর্তীকালে ১৩৮৯ সালে সার্বিয়া, বসনিয়া, ওলেসিয়া, হাঙ্গেরী ও পোল্যান্ডের যোথবাহিনী ১৩৮৯ সালে কসোভোর প্রান্তরে প্রথম মুরাদের নেতৃত্বে অটোমান সৈন্য বাহিনীর বিরুদ্ধে এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। ইতিহাসখ্যাত এই প্রথম কসোভোর যুদ্ধ ইতিহাসের এক মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা কারণ এই যুদ্ধের পর থেকেই সমস্ত বলকান অঞ্চল পরবর্তী ৬০০ বছরের জন্য অটোমানদের করায়ত্বে চলে আসে।

প্রথম কসোভো যুদ্ধ ১৩৮৯

কসোভোর প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয় ২৮ জুন ১৩৮৯ সালে। তখন ছিল ওসমানীয় সুলতান প্রথম মুরাদের শাসনকাল। তাঁর সময়েই মূলত ইউরোপে তুর্কী সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করে। এজন্য ঐতিহাসিকগণ তাঁকে ইউরোপে তুর্কী সাম্রাজ্যে প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন।

এক্ষেত্রে ইতিহাসবিদStamford J Shaw এর বিখ্যাত গ্রন্থের উক্তিটি প্রযোজ্যঃ-

> With Orhan's eldest son, Sulayman, preceding him in death, succession fell to his second son, Murad who earlier had replaced his brother in command of the Ottoman forces in Europe. Murad used the base left by his father in Gallipoli to conquer Thrace, Macedonia, Bulgaria, and Serbia; actually therefore he was the real builder of the first Ottoman Empire in Europe[২০]

১৩৫৯ খ্রীঃ অরখান মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর বড় আশা ছিল তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র সুলায়মান ওসমানীয় বংশের গৌরব বৃদ্ধি করবেন কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে অকস্মাৎ ঘোড়া থেকে পড়ে সুলাইমান মৃত্যুবরণ করায় তাঁর ছোট মুরাদ সিংহাসনে বসেন। মুরাদ সিংহাসনে বসার পর পরই ১৩৬১ সালে মহানগরী আদ্রিয়ানোপল দখল করেন এবং তুরস্ক সাম্রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করেন। অল্পদিনের মধ্যে আগ্রা ও ফিলিপোপোলিস তার দখলে আসে। ফলে থ্রেস ও মেসিডোনিয়া বা বর্তমান রোমেলিয়ার এক বৃহদাংশ তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হয়। কনস্টান্টিনোপলের চতুর্দিকস্থ ভূ-ভাগব্যতীত সমগ্র থ্রেস ইতোপূর্বেই তাদের করায়াত্ব হয়। ১৩৭৩ খ্রিঃ ক্যাভালা, সেরেজ ও অন্যান্য স্থান তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেন। ফলে মেসিডোনিয়ার অধিকাংশই তাদের দখলে চলে গেল।

এভাবে সমগ্র প্রায় বলকান পর্বতমালা পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করে ১৩৭৫ খ্রীস্টাব্দে তুর্কী বাহিনী উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হয়। বলকান অতিক্রম করে তা সুদৃঢ় নিসা নগর আক্রমন করে। পঁচিশ দিন অবরোধের পর কনস্টান্টাইনের জন্মভূমি তুর্কীদের নিকটদ্বার খুলে দেয়। স্বরাজ্যের কেন্দ্রভাগে আক্রান্ত হওয়ায় সার্বিয়ার রাজা ডেসপট (Despot) সন্ধির আবেদন ভিক্ষা করেন। বার্ষিক সহস্র পাউন্ড (প্রায় আধসের) রৌপ্য করদান ও তুর্কী বাহিনীতে সহস্র অশ্বারোহী সরবরাহের যোগানের অঙ্গীকারে তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করে। বুলগেরিয়ার রাজা ক্রাল (Karl)

সিসভানের কিছু বেশী বুদ্ধি ছিল। তুর্কীরা তাঁর রাজ্যে পৌছার পূর্বেই তিনি বিনীতভাবে শান্তি প্রার্থনা করেন। কিন্তু অর্থ অপেক্ষা সুলতানকে কন্যাদান করাই তাঁর অধিকতর মন:পুত হয়। পোপ ও ক্যাথলিক জগতের সাহায্য লাভের আশায় গ্রীক সম্রাট নিজের ধর্মমত পরিবর্তন করতে ও কুণ্ঠিত হলেন না। কিন্তু মতান্তর গ্রহন করে ও তিনি কারও নিকট কোন সাহায্য পেলেন না। নিরুপায় হয়ে হতভাগ্য সম্রাট নিজেকে মুরাদের জায়গীরদার বলে ঘোষণা করেন।[২১] ছয় বৎসর পর্যন্ত মুরাদ যুদ্ধ থেকে বিরত থাকেন। যুদ্ধকালে এক বা একাধিক অশ্বারোহী দিয়ে সাহায্য করবে, এই শর্তে মুসলমানরা বিজিত জনপদে জায়গীর পায়। লাল বর্ণের পতাকা তখন থেকে ওসমানিয়া বাহিনীর জাতীয় পতাকা বলে নির্দিষ্ট হয়। খ্রীস্টান প্রজাদের সাহায্যে তিনি আয়নাক নামে একদল অনুচর গঠন করেন। আস্তাবল পরিস্কার রাখা, শিবির খাটান, মালগাড়ী চালান প্রভৃতি হলো তাদের কাজ।

এই শান্তির মধ্যেও মুরাদ রাজ্য বিস্তার চালিয়ে যান। অবশ্য এ জন্য তিনি তরবারী হাতে না নিয়ে রাজনৈতিক কূটবুদ্ধির মাধ্যমে সম্মুখে অগ্রসর হন। ১০টি সেলজুক রাজ্যের মধ্যে চারটিই ওসমানিয়া সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হয় এবং বাকী ছয়টি জয়ের ভার বায়েজীদের উপর পড়ে।

কারমানের সহিত বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও এশিয়া মাইনরে তুর্কী জাতির প্রাধান্য লাভের জন্য ১৩৮৭ খ্রীস্টাব্দে এই দুই শক্তিশালী রাজ্যের মধ্যে বিবাদ বাঁধল। রোমে উভয় পক্ষে গুরুতর যুদ্ধ হয়। বায়েজিদ বিদ্যুৎগতিতে পুন:পুন ভীষণভাবে শত্রুপক্ষের উপর আরোপিত হয়ে তাদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে।

পরাজিত হয়েও স্ত্রীর মধ্যস্থতায় কারামন রাজার রাজ্যে ও মস্তক দুইই পক্ষ পায়। তবে তাদের কে সুলতানের অধীনতা স্বীকার করতে হয়। সৈন্যদের কে বিদায় দিয়ে মুরাদ বিশ্রাম লাভের জন্য ব্রুসায় গমন করেন। তাঁর এক সেনাপতি তাঁকে নিকটবর্তী তেক্কি রাজ্য আক্রমনে প্রলুব্ধ করলে তিনি উত্তর দেন, "সিংহ মক্ষিকা শিকার করে না"। ১৩৮৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে প্রায় সমগ্র প্রাচীন থ্রেস ও বর্তমান রুমেলিয়া তুর্কীদের হস্তগত হয়; এর বাইরে ও কয়েকটি প্রয়োজনীয়

স্থান তাদের দখলে আসে। তারা চিরাচরিত নিয়মে এসকল স্থানে তুর্কী ও আরব উপনিবেশ স্থাপন করতে তাকে। ইহাকে ভাবী সংগ্রামের লক্ষণ মনে করে। সার্বিয়া, বুলগেরিয়া ও বসনিয়ার স্লাভেরা তুরস্কের বিরুদ্ধে ক্রুসেড ঘোষণা করে। পোল্যান্ডের স্লাভেরা তাদেরকে সৈন্য পাঠায়। আলবেনিয়ার স্কিপেটার এবং ওয়ালেচিয়ার অর্ধ-রোমান অধিবাসীরা ও তাতে যোগ দেয়। তুর্কীদের জ্ঞাতি হলেও হাঙ্গেরীর ম্যাগিয়ারেরা বিধর্মীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র গ্রহণ করে। এই ক্রুসেডের নেতৃত্ব দেয় সার্বিয়া। তুর্কিদের ইউরোপ আক্রমনের পূর্বে সার্বিয়া রাজা ষ্টিফেন বেলগ্রেড হতে মারিজা নদী এবং কৃষ্ণসাগর হতে আদ্রিয়াতিক সাগর পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগে রাজত্ব করতেন। এমনকি তিনি 'রুমেলিয়ার সম্রাট ও খৃস্টভক্ত মেসিডোনীয় জার', উপাধি পর্যন্ত গ্রহণ করেন।

বুলগেরিয়া ও বসনিয়ায় প্রথমে যুদ্ধ আরম্ভ করে। একদল তুর্কি সৈন্য বসনিয়ার ভিতর দিয়ে গমন করছিল। ১৩৮৮ খ্রী: মিত্র শক্তি তাদের আক্রমন করলে ২০,০০০ সৈন্যের মধ্যে ৫০০০ সৈন্য মাত্র কোনরূপ রক্ষা পায়। মুরাদ এই অপমান সহ্য করতে না পেরে বুলগেরিয়া রাজ সিসভানের উপর রুষ্ট হন। কারন সিসভান মিত্রতার ভান দেখিয়ে হঠাৎ শত্রুপক্ষে যোগদান করেন। সেনাপতি আলী পাশার নেতৃত্বে ৩০০০০ সৈন্যের একটি সেনাবাহিনীর চৌকস দল ১৩৮৯ সালে বলকান পর্বত অতিক্রম করেন। স্কুমলা তাঁর নিকট আত্মসমর্পন করে; তির্নোভা ও প্রভাদি তাঁর হস্তগত হলে সিসভান নিকোপোলিসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তুর্কি বাহিনী তাও অবরোধ করলে রাজা শান্তি প্রার্থনা করতে বাধ্য হন এবং নিয়মিত করদান সহ সিলিস্ট্রিয়া ছেড়ে দেওয়ার শর্তে সম্মত হন। কিন্তু শর্ত পূরণ না করায় পুনরায় যুদ্ধ বাঁধে। তুর্কি বাহিনী সুদৃঢ় রিজা ও হিরস্কোভা দূর্গ অধিকার করে নিকোপোলিস অবরোধ করলে রাজা বিনাশর্তে আত্মসমর্পন করেন। এতে তাঁর জীবন রক্ষা পেল; কিন্তু বুলগেরিয়া তুরস্ক সাম্রাজ্যের অধীনস্ত হয়ে যায়। ফলে তুর্কী সীমান্ত দানিয়ুব নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে যায়। একটি মাত্র যুদ্ধেই ১৫০০০ তুর্কী নিধন করে মিত্রশক্তি তেজে ভাটা পড়ে। সিসভানের পতনের পর সার্বিয়ার রাজা লাজারাস সচল হয়ে উঠেন। মিত্র শক্তির অধিক সৈন্য তাঁর অধীনে সমবেত হলে তিনি মুরাদকে প্রকাশ্য যুদ্ধ

আহবান করে কসোভো প্রান্তরে শিবির স্থাপন করেন। ইতোমধ্যে সুলতান স্বয়ং তুর্কী বাহিনীর সেনাপতিত্ব গ্রহণ করেন। দুর্গম পার্বত্য পথ অতিক্রম করে তিনি মিত্র শক্তির সম্মুখীন হন। বিপক্ষের সৈন্য সংখ্যা এত বেশী ছিল যে, মুরাদ সারা রাত নামাজ পড়ে ও আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে কাটান।

২৭ শে আগস্ট উভয় পক্ষ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হলো, লাজারাস মিত্র বাহিনীর মধ্যভাগ, তাঁর ভ্রাতৃস্পুত্র ব্রাঙ্কোভিচ দক্ষিণ বাহু ও বসনিয়ার রাজা ভার্কো বামবাহু পরিচালনার ভার নিলেন। তুর্কী বাহিনীর কেন্দ্রভাগ স্বয়ং মুরাদের দক্ষিণ পার্শ্ব শাহজাদা বায়েজীদের এবং বাম পার্শ্ব শাহজাদা ইয়াকুবের অধীনে স্থাপিত হইল। দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধের ফলাফল অনিশ্চিত রইল। যুদ্ধের এক পর্যায় তুর্কী বাহিনীর বাম পার্শ্বস্থ এশিয়ার সৈন্যরা সার্বিয়া ও বসনিয়ার সৈন্যদের পরাক্রমে পৃষ্ঠ প্রদর্শনের উপক্রম করে; কিন্তু বায়েজীদ বিদ্যুৎগতিতে দক্ষিণ-পার্শ্ব হতে সৈন্য সাহায্য নিয়ে আসায় বিপদ কেটে যায়। একটি ভীষণ গদা হাতে নিয়ে তিনি উন্মাদের ন্যায় শত্রু দলন আরম্ভ করে দেন। এমন সময় এক শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটে, মিলোশ কবি লোভিশ নামে এক সার্বিয়ান যোদ্ধা গোপনীয় কথা বলবার ভান করে মুরাদের নিকট গিয়ে হঠাৎ তাঁর বুকে ছুরি বসিয়ে দেয়। দেহরক্ষীরা তাকে ধরে রাখলেও সে তিনবার নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় এবং শেষ পর্যন্ত জেনিসারিদের হাতে প্রান বিসর্জন দেয়।

আঘাত মারাত্মক হলেও মুরাদের অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বলে তাঁর নেতৃত্ব সৈন্যরা ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা পায়। তিনি তাঁর দেহরক্ষী দিগকে শত্রুপক্ষের উপর আপতিত হতে আদেশ দান করেন। এবার বিপক্ষ বাহিনী পলায়ন করতে বাধ্য হয়। স্বয়ং লাজারাস তাদের হাতে বন্দী হন। তাঁর প্রানদন্ডের আদেশ দিয়ে সুলতান চিরতরে চক্ষু মুদ্রিত করেন। প্রাচীন গ্রীসের হার্সোডিয়াম, বর্তমান ফ্রান্সের কাঁর্লো ফোর্ডে ও দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসবাদীর ন্যায় গুপ্তঘাতক মিলোস সার্বিয়ার জাতীয় বীর বলে পরিগণিত হয়।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক Knodles and Rycantএর মতে, "তুর্কী সুলতানদের মধ্যে মুরাদের ন্যায় আর কেহই বিধর্মী দলনে এত উৎসাহ দেখান নাই"। এই সাহসী বীর পুরুষ তাঁর প্রতিটি অভিযানেই সফলকাম হন। ক্রয়, বিবাহ ও অস্ত্রবলে তিনি এশিয়ার তাঁহার রাজ্যসীমা অনেক বর্ধিত করেন। গ্রীক ভূপতিদের অনৈক্য ও ভীরুতার ফলে থ্রেস বা রুমানিয়ার এক বৃহদাংশ তাঁর পদানত হয়। কনস্টান্টিনোপলের বাহিরে গ্রীক সম্রাটের হাতে থ্রেসের অতি সামান্য অংশই অবশিষ্ট ছিল। বস্তুত মুরাদ তাঁকে সাম্রাজ্যহীন সম্রাটে পরিণত করেন। বুলগেরিয়ার অধিকাংশ জয় করে তিনি কসোভোর রণক্ষেত্রেই সৈন্যরা বায়েজীদকে সুলতান বলে সালাম করতে থাকে। এ যুদ্ধের পর বায়েজীদ ভিদিনের দিকে অগ্রসর হয়ে দক্ষিণ দিকে ফিরলেন। সফলতার সহিত সার্বিয়া যুদ্ধ শেষ করে বায়েজীদ সার্বিয়া গমন করেন। ১৩৯০ সালে তিনি বিদ্যুতের ন্যায় পুনরায় ইউরোপে আবর্তিত হলেন। ১৩৯১ খ্রিঃ ওয়ালিচিয়ার রাজা মাইরচি তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। হাঙ্গেরীর সাহায্যে বসনিয়া সুলতানকে বাঁধা দান করেন। ১৩৯২ সালে হাঙ্গেরীর রাজা সিগিসমান্ড বুলগেরিয়ায় প্রবেশ করে কিছু সুবিধা লাভ করলে ও শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়ে স্বরাজ্যে বিতাড়িত হন।

মুরাদের সময় সংঘটিত সর্ববৃহৎ যুদ্ধ ছিল সম্ভবত প্রথম কসোভোর যুদ্ধ (১৩৮৯ খ্রী:) যা দ্বারা সার্বিয়া বিজিত হয় এবং দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। মুরাদ যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন এবং তাঁর উত্তরাধিকারী প্রথম বায়েজীদ তাঁর অর্ধসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করেন।[২২]

কসোভো যুদ্ধের কারণঃ

সার্বিয়ার রাজা লাজারাসের সঙ্গে তুরস্কের সুলতান মুরাদের সংঘর্ষের পশ্চাতে কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথমতঃ বাইজানটাইন সাম্রাজ্য এক সময়ে অর্থ সম্পদে সমৃদ্ধ ছিল। এজন্য অটোমান তুর্কীরা এই সাম্রাজ্য ব্যয় করতে প্রলুব্ধ হয়। দ্বিতীয়তঃ বাইজানটাইন সম্রাট ছিলেন খ্রিস্টান, অন্য দিকে অটোমান সুলতান ছিলেন মুসলমান। অধিকন্তু, খ্রীস্টান বালকদের নিয়ে অটোমান তুর্কীদের জেনিসারি বাহিনী গঠিত হয়েছিল। এতে খ্রীস্টান যুবরাজরা ঈর্ষান্বিত হয়েছিল

ফলশ্রুতিতে খ্রীস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে সর্বদা বিরোধ লেগে থাকত। এছাড়া ইউরোপীয়রা মুসলমানদের হাতে পরাজয়ের কথা ভুলতে পারে নি। তাই তারা সার্বিয়ার রাজা লাজারাসের নেতৃত্বে পুনরায় সমবেত হয়ে মুসলমানদেরকে ইউরোপীয় ভূখন্ড হতে বিতাড়িত করতে চাইল। এভাবে দুই পরস্পর বিরোধী শক্তির মধ্যে ১৩৮৯ খ্রীস্টাব্দে কসোভো প্রান্তরে প্রথম কসোভো যুদ্ধ সংগঠিত হয়। সার্বিয়া ও বুলগেরিয়ার মাঝখানের স্থলটিতে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। মুরাদ সাহাসের সাথে সৈন্য পরিচালনা করেন এবং সম্মিলিত বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। লাজারাস বন্দী হলেন এবং সুলতানের সহিত চুক্তিভঙ্গের ফলে তাকে ফাঁসির কাষ্ঠে প্রানদন্ড দেয়া হল। পরিশেষে বলা যায় যে, প্রথম কসোভোর যুদ্ধ তুরস্কের ইতিহাসে একটি চূড়ান্ত দিক নিয়ন্ত্রকারী ঘটনা। সার্বিয়া, বসনিয়া ও মেসিডোনিয়ায় প্রবেশ করেন। তিনি যুগপৎ সদাশয় ও কঠোর প্রকৃতির লোক ছিলেন। প্রজারা তাঁকে যেমন ভালবাসত, তেমন ভয়ও পেত। তিনি কথাবার্তা খুব কম বলতেন। অন্যরা তাঁর মনোভাব সহজে জানতে পারত না। একত্রিশ বৎসর রাজত্বের পর ৬৮ বৎসর বয়সে তিনি নিহত হন। বায়েজীদ তাঁর মরদেহ নিয়ে মহাসমারোহে শহরের পশ্চিমাংশে এক মনোরম ভবনে সমাহিত করেন।[২৩] কসোভো প্রান্তরে যেখানে তিনি দেহত্যাগ করেন, সেখানে ও একটি অট্রালিকা নির্মিত হয়। ঐতিহাসিক গীবন বলেন, "তাঁহার মেজাজ নরম ছিল; তিনি সাধারণ পোষাক পরতেন এবং গুন ও বিদ্যায় আদর করতেন"।

কসোভোর যুদ্ধে সার্বিয়ার সহিত বসনিয়া, আলবেনিয়া, ওয়ালাসিয়া, হাঙ্গেরী ও পোল্যান্ড অংশ গ্রহণ করে। ১৩৮৯ খ্রীস্টাব্দে কসোভো নামক স্থানে তুমুল যুদ্ধ হয়। মুরাদের পুত্র বায়েজীদ বীরত্বের সহিত যুদ্ধ পরিচালনা করেন। অবস্থা বেগতিক বুঝে লাজারেসের জামাতা ও সেনাপতি ভুক ব্রাকোভিচ ১২ হাজার সৈন্যের একটি দল নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। প্রচন্ড যুদ্ধের পর ইউরোপীয় সম্মিলিত বাহিনী অটোমানদের নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। যুদ্ধে অটোমানদের ১২০০০ সৈন্য হতাহত হয়। পক্ষান্তরে সম্মিলিত ইউরোপীয় তথা মিত্র বাহিনীর ৭৭ হাজার সৈন্য যুদ্ধে প্রান হারায়। সার্বিয়ার রাজা মুরাদের হাতে বন্দী হলেন। চুক্তি ভঙ্গের

অপরাধে তাঁকে প্রানদন্ডে দন্ডিত করা হলো। কসোভোর যুদ্ধ অটোমান তুর্কী সাম্রাজ্যের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই যুদ্ধে পরাজিত হলে ইউরোপে তাদের সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রচেষ্টা বিশেষভাবে বিঘ্নিত হতো। গুরুত্বের দিক দিয়ে বিচার করলে কসোভোর যুদ্ধকে 'বলকানের ওয়াটারলু' বলিয়া অভিহিত করা চলে।[২৪]

এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে সার্বিয়া অটোমানদের সাম্রাজ্যভূক্ত হলো এবং পরবর্তী পাঁচশত বৎসরের জন্য তুর্কীদের সহিত স্লাভ জাতির ভাগ্য বিজড়িত হয়ে পড়ল। কসোভোর যুদ্ধ তুর্কী দিগকে তৎকালীন ইউরোপের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সামরিক শক্তি বলে বিবেচিত হবার মর্যাদা প্রদান করে। এর ফলে ইউরোপীয়দের মনে একটি সামগ্রিক ভীতি ও ত্রাসের সঞ্চার হল। পক্ষান্তরে অটোমানগণ ইউরোপে সাম্রাজ্য বিস্তারে নবতর শক্তি ও অনুপ্রেরণা লাভ করল। ১৩৮৭ সালে সংঘটিত কুনিয়ার যুদ্ধে তিনি সর্বপ্রথম একজন সুদক্ষ সেনাপতি হিসাবে স্বীয় প্রতিভার পরিচয় প্রদান করেন। এ যুদ্ধের পর হতেই তিনি নতুন উপাধি ইলদ্রিম অর্থ্যাৎ বিদ্যুৎ নামে আখ্যায়িত হন।[২৫]

১৩৮৯ সালের ঐতিহাসিক কসোভোর যুদ্ধে অটোমান সেনাবাহিনী পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দেন। কসোভোর যুদ্ধ শেষে মিলশ ওবরানোভিচ নামক একজন আত্তায়ীব হাতে মুরাদ ভীষণভাবে আহত হন এবং পরে অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যু শয্যায় মুরাদ তাঁর প্রথম পুত্র বায়েজীদকে তাঁহার উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করেন এবং বায়েজীদ নির্বিঘ্নে সিংহাসন লাভ করেন। সিংহাসন লাভের পর বায়েজীদ প্রথমেই তাঁর ভ্রাতা ইয়াকুবকে ঠান্ডা মস্তিকে হত্যা করেন। ইয়াকুব ও কসোভোর যুদ্ধে বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন।[২৬] মুরাদ ও ইয়াকুবের মৃতদেহ কসোভো থেকে রাজধানী ব্রুসায় প্রেরণ করা হয় এবং সেখানে অবস্থিত অটোমান রাজকীয় সমাধিস্থানে সমাহিত করা হয়।

কসোভোর যুদ্ধে সার্বিয়ার রাজা ল্যাজারের পরাজয় ও মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র স্টিফেন বুলকোভিচ নব অধিষ্ঠিত অটোমান সুলতান বায়েজীদের আনুগত্য স্বীকার করে সিংহাসনে উপবেশন

করেন। উভয়ের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির শর্তানুসারে স্থির হয় যে, সার্বিয়া সায়ত্ত্বশাসন লাভ করবে এবং সুলতানকে নির্দিষ্ট হারে বাৎসরিক কর প্রদান করবে। দ্বিতীয়তঃ সুলতানের অধীনে পাঁচ হাজার সার্বিয়ান সৈন্য থাকবে। সার্বিয়ার রৌপ্য খনির অর্থ হতে এর ব্যয়ভার বহন করবে এবং স্টিফেন ব্যক্তিগতভাবে সুলতানের অধীনে এই সার্বিয়ান বাহিনী পরিচালনা করবে।

বস্তুতপক্ষে, বলকান অঞ্চল তথা সমগ্র ইউরোপে অটোমান তুরস্কের এক অবিচল অবস্থা আনয়ন করে।[২৭] চতুর্দশ শতাব্দীতে বুলগেরিয়া (১৩৯৬) দখলের মাধ্যমে ওসমানীয় সুলতানরা বলকান অঞ্চলের নিয়ন্ত্রন ভার গ্রহণ করে। ১৪৫৩ সালে ওসমানীয় সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদ (১৪৫১-১৪৮১) উপদ্বীপের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ কনস্টান্টিনোপল দখল করেন। মহামতি সুলায়মান (১৫২০-১৫৬৬) এর শাসনকালে তুর্কীরা বেলগ্রেড দখল করে।[২৮]

মূলত, পঞ্চদশ শতকের শেষ দিক হতে তুরস্ক ইউরোপের পূর্ব ভাগের আধুনিক ইউরোপীয় দেশগুলো এই শতক থেকে বহুশত বছরের জন্য ওসমানীয় সুলতানদের অধীনে চলে যায়। এই অঞ্চলটি দীর্ঘকাল ওসমানীয় তুর্কী শাসনে থাকলেও , কৃষ্ণকায় ইসলাম ধর্মাবলম্বী শাসক তুর্কী জাতির সঙ্গে শ্বেতকায় খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী জাতির ইউরোপীয় প্রজাদের কোন সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়ে উঠতে পারেনি। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই বলকান অঞ্চল বিশ্ব ইতিহাসে একটি আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়। ওসমানীয় তুর্কীদের শাসন ও শোষণের ফলে বলকান অঞ্চলের জনগনের মধ্যে জাতীয়তাবাদী ধারণা দানা বাঁধতে থাকে। অটোমান শাসনাধীন বলকান অঞ্চলের এ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের শিখা সমগ্র বলকান অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।[২৯]

দ্বিতীয় কসোভো যুদ্ধ ১৪৪৮

দ্বিতীয় কসোভোর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ১৭-২০ অক্টোবর, ১৪৪৮ খ্রীস্টাব্দে। এ যুদ্ধ ছিল অটোমান সাম্রাজ্য তথা দ্বিতীয় মুরাদের বিরুদ্ধে হাঙ্গেরী সাম্রাজ্য ও ওয়ালেচিয়ার অধিপতি জন হুনিয়াদি[৩০] এর মধ্যে। ১৪৪৪ খ্রীস্টাব্দের ১০ই নভেম্বর অটোমান সুলতান দ্বিতীয় মুরাদের

সহিত হুনিয়াদির নেতৃত্বে সম্মিলিত খ্রীষ্টান বাহিনীর মোকাবেলা হয়। সম্মিলিত খ্রিস্টান বাহিনীর বাম ও ডান বাহু পরিচালনার ভার যথাক্রমে ওয়ালসিয়া ও হাঙ্গেরীর সৈন্যদের উপর ন্যস্ত ছিল। কার্ডিনাল জুলিয়ানের নেতৃত্বে ফরাসীর ধর্মযোদ্ধাগণ ও হাঙ্গেরীর রাজার নেতৃত্বে রাজকীয় রক্ষী বাহিনী এই যুদ্ধে হুনিয়াদির সহযোগিতা করেছিল।

মূলত এটি ছিল একটি নিস্পত্তিমূলক অটোমান বিজয়।[৩১] ১৪৪৮ সালে কসোভো প্রান্তরে তিনদিন যুদ্ধের পর পূর্ব শত্রু হুনিয়াদিকে পুনরায় শোচনীয় ভাবে পরাজিত করে। ১৪৫১ খ্রীস্টাব্দে আদ্রিয়ানোপলে তাঁর মৃত্যু হয়।[৩২] মুরাদ সম্মান ও ন্যায় পরায়নতার সাথে ত্রিশ বছর রাজত্ব করেন। তিনি ছিলেন যেমন ক্ষমতাশীল, তেমনি মহৎ। দীর্ঘ ৩০ বছরের মধ্যে কোন অসম্মান কার্যে তাঁর নামে কোন কলঙ্কজনক কাজের উদাহরণ পাওয়া যায়নি। পক্ষান্তরে তুর্কি বাহিনীর দুই বাহু পরিচালনার দায়িত্ব পড়ে সুলতানের দুই পুত্রের উপর। সুলতান মুরাদ জেনিসারীদের নিয়ে তুর্কী বাহিনীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করলেন। খ্রীস্টানদের দ্বারা পূর্ব স্বাক্ষরিত সন্ধিপত্রের একটি ছিন্ন প্রতিলিপি বল্লমের অগ্রভাগে সকলের সম্মুখে তুলে ধরলেন।

হুনিয়াদি সর্বপ্রথম তুর্কি বাহিনীকে আক্রমণ করিলেন এবং উভয় বাহিনীর মধ্যে পূর্নাঙ্গ যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে খ্রীস্টান সৈন্যরা তুর্কী বাহিনীর উপর প্রাধান্য বজায় রেখে চলছিল। এমনকি হুনিয়াদীর প্রবল আক্রমণের সম্মুখে তুর্কী বাহিনীর একাংশ যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শনে বাধ্য হইল। যুদ্ধের ফলাফল আয়ত্বের বাহিরে চলে যাচ্ছে দেখে সুলতান ক্ষনকালের জন্য বিচলিত হয়ে পড়িলেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এই সময় কারাভা পাশা নামে আনাতোলিয়ার বেলারবে সুলতান মুরাদ কে সর্বশক্তি নিয়োগ করে খ্রীস্টান বাহিনীর উপর পাল্টা আক্রমণের পরামর্শ দিলেন। সুলতান মুরাদ বহুকষ্টে বিক্ষিপ্ত তুর্কী বাহিনীকে একত্র করলেন এবং নিজের পরিচালনাধীনে জ্যানিসারী বাহিনী নিয়ে অসীম বীরত্বের সহিত আক্রমণ পরিচালনা করলেন। ফলে মুহূর্তের মধ্যে যুদ্ধের গতি পরিবর্তন হয়ে গেল। হাঙ্গেরীর রাজা ল্যাডিসলজ যুদ্ধ

ক্ষেত্রে নিহত হলেন এবং তার ছিন্ন মস্তক একজন তুর্কী সৈন্য বল্লমের অগ্রভাগে উচ্চে তুলে ধরল। এতে খ্রিস্টান বাহিনীর মধ্যে চরম হতাশা ও সন্ত্রাসের সৃষ্টি হয়।

ওয়ালসিয়া বাহিনী রনে ভঙ্গ দিয়া যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই হাঙ্গেরী বাহিনী তাদের অনুসরণ করে। হুনিয়াদীর ব্যক্তিগত বীরত্ব আর কোন কাজেই আসেনাই। অবশেষে অনিবার্য পরাজয় লক্ষ্য করে প্রানভয়ে পলায়ন করিলেন। অটোমান সৈন্যগন পরাজিত শত্রুবাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন করে যাকে পেয়েছে তাকেই হত্যা করেছে। এই যুদ্ধে ইউরোপীয় মধ্যযুগের ইতিহাসে একটি ভাগ্য নির্ধারণকারী চূড়ান্ত যুদ্ধ বলে অভিহিত করা চলে। কারন এই যুদ্ধে অটোমান তুর্কীদিগকে ইউরোপ ভূ-খন্ড থেকে বহিস্কার করার জন্য সম্মিলিত খ্রীস্টান শক্তির শেষ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। অপরদিকে মুরাদের নেতৃত্বে অটোমানগণ এই যুদ্ধে পরাজিত হলে হয়তো তাদের ভাগ্য চিরতরে ইউরোপের ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত। তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রধান উদ্যোক্তা ছিল হাঙ্গেরী। কিন্তু হাঙ্গেরী প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ না হয়ে হাঙ্গেরীর মিত্রশক্তি স্লাভজাতিগণই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল বেশি। কারণ এই যুদ্ধের ফলে সার্বিয়া ও বসনিয়ার স্বাধীনতা বিপন্ন হল এবং দেশ দুটি সরাসরি অটোমান সাম্রাজ্যভূক্ত হয়ে পড়ল।

এরই ধারাবাহিকতায় ১৮২৯-১৯০৮ সালের মধ্যে গ্রীস, মন্টিনিগ্রো, সার্বিয়া, রুমানিয়া ও বুলগেরিয়ার মত স্বাধীন রাষ্টের উদ্ভব হয়। শুধু এটাই নয় ১৯১২ সালের (প্রথম বলকান যুদ্ধ) মধ্যে ওসমানীয়রা একমাত্র থ্রেস (Thrace) ছাড়া সমগ্র ইউরোপ থেকে বিতাড়িত হয়।[৩৩]অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ওসমানীয় সুলতানগণ বলকান খ্রিষ্টানদের প্রতি যে বিরূপনীতি গ্রহণ করেছিল সাবেক যুগোস্লাভ প্রেসিডেন্ট স্লোভেদান মেলোসেভিস (১৯৪১-২০০৬) ও একটি প্রতিহিংসাপরায়ন মানসিকতা থেকে ঐ ওসমানীয় তুর্কী শাসকদের বংশধর বলকান মুসলমানদের প্রতি এর চেয়েও কঠিন এবং হিংসাত্মক নীতি গ্রহণ করেছিলেন। মধ্যযুগে চেঙ্গিস খান (১১৬৭-১২২৭) ও হালাকু খানের (১২৫৬-১২৬৫) মাধ্যমে যে ধ্বংসযজ্ঞ ও

মানবতাবিরোধী কর্মকান্ডের যাত্রা শুরু হয়েছিল তা আজও থেমে নেই বরং তা মধ্যযুগীয় বর্বরতাকেও হার মানিয়েছে।

মূলত, পঞ্চদশ শতকের শেষ দিক হতে তুরস্ক ইউরোপের পূর্ব ভাগের আধুনিক ইউরোপীয় দেশগুলো এই শতক থেকে বহুশত বছরের জন্য ওসমানীয় সুলতানদের অধীনে চলে যায়। এই অঞ্চলটি দীর্ঘকাল ওসমানীয় তুর্কী শাসনে থাকলেও কৃষ্ণকায় ইসলাম ধর্মাবলম্বী শাসক তুর্কী জাতির সঙ্গে শ্বেতকায় খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী জাতির ইউরোপীয় প্রজাদের কোন সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়ে উঠতে পারেনি।ওসমানীয় সুলতানগণ কেবলমাত্র তাদের সামরিক শক্তির জোরে এই বিজাতীয় প্রজাদের নিজ অধিকারে রাখত।[৩৪] এভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশক পর্যন্ত বলকান অঞ্চলে তুর্কী সুলতানদের প্রভাব প্রতিপত্তি বজায় থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই বলকান অঞ্চলে মুসলমানদের প্রভাব কমতে শুরু করে। মোল্লাতন্ত্র এবং ধর্মীয় গোড়ামীর ফলে তুরস্কে আধুনিক যুগের উপযোগী সামরিক শক্তি নিয়ে আধুনিক মারনাস্ত্রে সজ্জিত দেশগুলো যথা রাশিয়া, প্রভৃতি দেশের সাথে এঁটে উঠতে পারেনি। তুর্কী সুলতানদের দুর্বলতার সুযোগে তাদের সাম্রাজ্যকে ভাগবাটোয়ারা করে নেওয়ার জন্য ইউরোপীয় শক্তিগুলো উদগ্রীব হয়ে পড়েছিল। তখন রাশিয়ার জার প্রথম নিকোলাস (১৮২৫-১৮৫৫) তুরস্ককে 'The Sick man of Europe' বলে ঘোষণা করে।[৩৫] অপরদিকে বলকান জাতিগুলো ওসমানীয় সুলতানদের কাছ থেকে শোষণ মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছা প্রকাশ করে। ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লবের জাতীয়তাবাদী আদর্শের প্রভাবে বলকান জাতীয়তাবাদ প্রখর হয়ে উঠে। এই অবস্থায় বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মধ্যে ওসমানীয় সুলতানরা একমাত্র থ্রেস (তুরস্কের পশ্চিমাংশ) ছাড়া বলকানের বাকি অংশ থেকে হাত গুটাতে বাধ্য হয়।

ইউরোপ থেকে তুরস্কের বিতাড়িত হওয়ার ক্ষেত্রে শুধু বলকান জাতীয়তাবাদী আন্দোলন নয় এর পেছনে প্যান স্লাভ (Pan Slav) আন্দোলনেরও একটি ভূমিকা রয়েছে। ইসলাম ধর্মাবলম্বী তুর্কীদের সাথে খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী ইউরোপীয় স্লাভ জাতিগুলোর ধর্ম ও জাতিগত পার্থক্য ছিল।

ফলে তাদের মধ্যে কোন প্রকার ঐক্য গড়ে উঠেনি। তাছাড়া প্যান-স্লাভ আন্দোলনের মাধ্যমে বলকান জাতীয়তাবাদও তীব্র হয়ে উঠে। উত্তর ও দক্ষিণ স্লাভ গোষ্ঠিকে একত্রিত করা এবং বলকানের অন্যত্র ছড়িয়ে থাকা স্লাভদের ঐক্যবদ্ধ করাই ছিল এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য।[৩৬]

স্লোভেদান মেলোসেভিস পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সার্বদের নিয়ে বৃহত্তম সার্ব রাষ্ট্র গঠন করতে চেয়েছিলেন। তাঁর মতে, "We believe that Serbs have the legitimate right to live in one country. If we must fight then by God, we will fight."[৩৭]মেলোসেভিস মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে ক্রসেড বলে ঘোষণা দেন। তিনি আরও বলেন আমরা আর পরাজিত হতে পারিনা। মেলোসেভিসের এই বক্তব্যকে সমর্থন করে তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জন মেজর (১৯৯০-১৯৯৬) বলেন, ইউরোপের ভূখন্ডে কোন মুসলমান রাষ্ট্রের অস্তিত্ব মেনে নেয়া হবে না।[৩৮] বিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে লক্ষ্য করা যায় যে,"The area (Balkan Peninsula) has been called the powder keg of Europe because so many wars have begun there"।[৩৯] এই বক্তব্যের যতার্থতা প্রমাণ হয় স্লোভেদান মেলোসেভিস তিনি তাঁর শাসনামলের পুরো সময় জুড়েই বিভিন্ন অজুহাতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য যুদ্ধগুলো হলঃ-

(ক) ক্রোয়েশিয়া যুদ্ধ (ডিসেম্বর ১৯৯১)

(খ) বসনিয়া যুদ্ধ (এপ্রিল ১৯৯২)

(গ) সেব্রেনিসায় গনহত্যা (১৯৯৫)

(ঘ) কসোভো যুদ্ধ (১৯৯৯)

কসোভোর স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল কারনের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় সমসাময়িক ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশ্লেষক স্যামুয়েল পি. হান্টিংটনের মন্তব্য। তাঁর মতে-

> It is my hypothesis that the fundamental source of conflictin this new world will not be primarily ideological or primarilyeconomic. The great divisions among humankind and the dominating source of conflict will be cultural. Nation Stateswill remain the most powerful actors in world affairs, but theprincipal conflicts of global politics will occur between nations and groups of different civilizations. The clash of civilizations will be the battle lines of our future.[৪০]

তুর্কীরা বরাবরই বীরের জাতি এবং বিভিন্ন সময়ে তাদের এই বীরত্বের জ্বলন্ত উদাহরণ ছিল ঐতিহাসিক ঘটনা। বিশ্ব সভ্যতায় বিশেষ করে শৌর্যবীর্যের ক্ষেত্রে তুরস্ক বা তুর্কী জাতির একটি গৌরবজনক অধ্যায় রয়েছে। মধ্যযুগে খ্রীস্টান ধর্মযুদ্ধের প্রতিরোধে তুরস্কের ভূমিকা ছিল অনন্য। মুসলামানদের পতন যুগে ইউরোপের এক বিরাট অংশ জুড়ে তুরস্ক প্রতিষ্ঠা করে এক সুবিশাল ওসমানীয় সাম্রাজ্য। যা প্রায় ৬০১ বছর ব্যাপী টিকেছিল বা রাজত্ব করেছিল উক্ত সাম্রাজ্যটি। তুর্কীদের অধীনে প্রথম কসোভো বিজয় লাভ করে অটোমান সুলতান ১ম মুরাদের রাজত্ব কালে। ২৮ জুন ১৩৮৯ সালে অনুষ্ঠিত কিংবদন্তির এ যুদ্ধে মুসলমানরা জয়লাভ করে এবং ইউরোপে তাদের ভিত্তি প্রস্তর সুদৃঢ় করে। একে একে সমগ্র বলকান অঞ্চলসহ বিভিন্ন দেশ জয়লাভ করে এই অটোমান তুর্কীরা। নতুন ধর্ম, সভ্যতা এ সংস্কৃতির সংস্পর্শে তাদের জীবনে আসে নতুন গতি। আধুনিক ইউরোপের ইতিহাসের একটি পর্যায়ে ওসমানীয় সুলতানদের নীতি ও আদর্শের কারণে তুরস্ক সাময়িকভাবে ইউরোপের রুগ্ন ব্যক্তি (The Sickman of Europe) হিসেবে খ্যাতি লাভ করে। অপর দিকে বলকান জাতিগুলো ওসমানীয় সুলতানদের শোষণমুক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছা পোষণ করে। ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লবের জাতীয়তাবাদী আদর্শের প্রভাবে বলকান জাতীয়তাবাদ প্রখর হয়ে উঠে। এই অবস্থায় বিংশ

শতাব্দীর প্রথম দশকের মধ্যে ওসমানীয় সুলতানগণ একমাত্র থ্রেস (তুরস্কের পশ্চিম অঞ্চল) ছাড়া বলকানের বাকী অঞ্চল থেকে হাত গুটাতে বাধ্য হয়। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পর অস্ট্রো-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্যের পতন হয়। বিশ্ব যুদ্ধের সমাপ্তির পরে শক্তিশালী দেশগুলো তুরস্কের বিভিন্ন অঞ্চল ভাগবাটোয়ারা করে নিয়ে যায়। এরই ধারাবাহিকতায় যুগোস্লাভিয়া ফেডারেল হয় এবং এতে কসোভো একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল হিসেবে মর্যাদা লাভ করে। ১৯৯০ সালে স্বাধীনতা ঘোষণা দিলেও একমাত্র আলবেনীয় ছাড়া অন্য কোন দেশ স্বীকৃতি দেয় নি। ১৯৯৯ সাল থেকে এটি পরিচালিত হয় জাতিসংঘের ১২৪৪ নং প্রস্তাবের অধীনে এবং ২০০৮ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী কসোভো একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

তথ্য নির্দেশ ও টীকা

১। ‘Ottoman Empire’ বা ওসমানীয় সাম্রাজ্য হচ্ছে তুরস্ক ভিত্তিক একটি দীর্ঘস্থায়ী মুসলিম সাম্রাজ্য। প্রথম ওসমানের নামানুসারে এই সাম্রাজ্যের নামকরণ হয় ওসমানীয় সাম্রাজ্য। ১৪ শতকে সেলজুক তুর্কীদের পতনের মধ্য দিয়ে ওসমানীয়দের উত্থান ঘটে। আর ওসমান ছিলেন একটি ক্ষুদ্র তুর্কী গোত্রের নেতা এবং পরবর্তীতে অন্যান্য তুর্কী গোত্রগুলোকে পরাজিত করে নিজ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন। প্রকৃতপক্ষে ২য় মুহাম্মদের শাসনামলে (১৪৫১-১৪৮১) অন্য সব তুর্কী গোত্র ওসমানীয়দের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হয়। উক্ত সাম্রজ্যটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যে পশ্চিম এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ ও উত্তর-পূর্ব আফ্রিকায় এক বিরাট অঞ্চল ব্যাপী বিস্তার লাভ করে। ওসমানীয় শাসকেরা ছিলেন মুসলমান ; তারা নিজেদের নামের সাথে খলিফা পদবী ব্যবহার করতেন । বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে তথা প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে আধুনিক তুরস্কের জন্ম লাভের সাথে সাথে এই দীর্ঘস্থায়ী সাম্রাজ্যটির অবসান ঘটে। সর্বশেষ ওসমানীয় শাসক ছিলেন ৬ষ্ঠ মুহাম্মদ (১৯১৮-১৯২২)। তুর্কী জাতির পিতা মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক ১৯২২ তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করে ১৯২৩ সালে তিনি তুরস্ককে তুর্কী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করেন এবং এর প্রেসিডেন্ট হন। তিনি প্রায় ৬০০ বৎসর ব্যাপী স্থায়ী এই সাম্রাজ্যটির অবসান ঘটান ১৯২৪ সালে খিলাফত বিলুপ্তির মধ্য দিয়ে।

২। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের শুরু হয় ১৯১৪ সালে এবং শেষ হয় ১৯১৮ সালে ‘League Of Nations’গঠনের মধ্য দিয়ে। ইতিহাস সাক্ষী যে, প্রথম মহাযুদ্ধের সূতিকাগার হিসেবে পরিচিত এই বলকান অঞ্চল। বসনিয়ার রাজধানী সারায়েভোর রাস্তায় ২৪ শে জুন,১৯১৪ গাভরিল প্রিনসেপ আততায়ীর গুলিতে অষ্ট্রিয়ার শাসক ফার্ডিনেন্ড নিহত হয়। এ হত্যা কান্ডের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ দেখা দেয়। অতএব সার্বরা প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ বাঁধিয়েছিল।এই প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পরে অস্ট্রো-হাঙ্গেরী সাম্রজ্যের পতন ঘটে।

৩। *The Encyclopedia Americana,* Vol.8, New York, 2001, p.204.

৪। Andrew Mango, *Turkey*, Thames and Hudson, London, 1968, p. 13

৫। তুরস্ক এমন একটি দেশ যা দুটি মহাদেশ যথা এশিয়া ও ইউরোপ মহাদেশের মধ্যস্থলে অবস্থিত। তুরস্কের ইউরোপীয় অংশ থ্রেস নামে পরিচিত এবং যে অংশটি এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত তা আনাতোলিয়া নামে পরিচিত।এখানে উল্লেখ্য যে, রাশিয়ার সীমানাও এশিয়া ও ইউরোপ মহাদেশ ব্যাপি।

৬। Bernard Lewis, *The Emergence of Modern Turkey*, Oxford University, London, 1968, p.1.

৭। ওসমান ছিলেন তুরস্কের বিখ্যাত অটোমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর নামে ওসমানীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ তাঁর নামকে ব্যাঙ্গ করে অটোমান বলে অভিহিত করে। যা পরবর্তীতে ইতিহাসে অটোমান সাম্রাজ্য হিসেবে পরিচিত লাভ করে।

৮। আশরাফ উদ্দিন আহমেদ, *মধ্যযুগের মুসলিম ইতিহাস (১২৫৮-১৮০০)*, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১৭৪।

৯। Robert Lee Wolf.*The Balkans in Our times,* Harvard University Press, Cambridge; *New Standard Encyclopedia Dictionary*, Vol-2, Chicago, 1984, p.54.

১০। *বাংলা বিশ্বকোষ*, তৃতীয় খন্ড, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃ-৩৬৮.

১১। Bruce MacFarlane, *Yugoslavia, Politics, Economics and Society,* London, 2002, p.31.

১২। ১৯৯০ সালে যুগোস্লাভ ফেডারেশন ভেঙ্গে যাওয়ার পর সার্বিয়া ও মন্টিনিগ্রোকে নিয়ে যুগোস্লাভিয়াটিকে থাকে কিন্তু ১৫ বছর পর ২০০৬ সালের ৩ জুন মন্টিনিগ্রো স্বাধীনতা ঘোষণা করে সার্বিয়া থেকে পৃথক হয়ে যায়।

১৩। *New Standard Encyclopedia Dictionary*, Vol.2, Chicago, 1984, p.54.

১৪। *প্রাগুক্ত।*

১৫। Robert Lee Wolf, *op. cit.* p.25.

১৬। *The New Encyclopedia of Britannica*, Vol. 14, 15th edition, 2004, p.591.

১৭। Bruce MacFarlane, *op.cit.*p.1.

১৮। *The World Almanac and Book of Facts-2006,* New York, p.751, p.759, p.801, pp.782-83.

১৯। John L Esposiot, *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World,* Vol.1, pp.782-83.

২০। Historian Stamford.J.Shaw, *History of the Ottoman Empire and Modern Turkey,* New York, 1976, Vol. 1, p.17.

২১। ড: এম আব্দুল কাদির, *তুরস্কের ইতিহাস*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ডিসেম্বর, ১৯৮৬।

২২। ইয়াহইয়া আরমাজানী, *মধ্যপ্রাচ্য অতীত ও বর্তমান*, মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক অনূদিত, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, তৃতীয় সংকলন, অক্টোবর, ২০০০, পৃ: ১৪৮।

২৩। Knolles and Rycant: *Turkish History*, Vol. I, p. 139

২৪। আশরাফ উদ্দিন আহমদ, *মধ্যযুগের মুসলিম ইতিহাস*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৭৬, পৃ. ২২১।

২৫। তড়িৎ গতিতে কার্য সম্পাদান এবং সসৈন্য এক স্থান হতে অন্যস্থানে গমনাগমনের জন্য বায়েজীদ এই উপাধী লাভ করেন। অটোমান ঐতিহাসিক এভলিয়া ইফেন্দী এই প্রসঙ্গে বলেন যে, বায়েজীদমাত্র এক বৎসরের মধ্যে সাতবার নানা কারণে আনাতোলিয়া হতে ওয়ালাসিয়া যাতায়াত করেছিলেন।

২৬। আশরাফ উদ্দিন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, ঢাকা-১৯৭৬, পৃ. ২২৫।

২৭। H. Anthony Salmone, *The Rise and Fall of Ottoman Turkey,* Metheun & Co. London, 1958, pp.39-40.

২৮। Philip. K. Hitti, *History of the Arabs*, 10th edition, London, 1970, p.709.

২৯। George Lenczowski, *The Middle East in World Affairs,* 4th edition, London, 1980, p. 39.

৩০। জন হুনিয়াদী হাঙ্গেরির একজন বিখ্যাত সেনাপতি যিনি মুরাদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত খ্রিস্টান বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন হাঙ্গেরীর প্রাক্তন রাজা সিগিসমান্ডের অবৈধ পুত্র। কিন্তু স্বীয় প্রতিভা ও শৌর্য-বীর্যের ফলে তিনি তৎকালীন খ্রিস্টান জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর হিসেবে সমাদৃত হন। হুনিয়াদি ইতালির যুদ্ধে খ্যাতি লাভ করেন এবং ওয়ালাসিয়ার হোয়াইট নাইট, উপাধি প্রাপ্ত হন।দীর্ঘ ২০ বছর যাবৎ তিনি অটোমান তুর্কিদের বিবুদ্ধে খ্রিস্টান সেনাবাহিনীর নেতা হিসাবে সাফল্যের সঙ্গে যুদ্ধে পরিচালনা করেন। তিনি আনুমানিক ১৩৯০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। যদিও অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন তার জন্ম সাল ছিল ১৪০৫-১৪০৭ এর মধ্যে। তিনি ১১ আগষ্ট ১৪৪৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও শোশিত পিপাসু তিনি ভোজনকালে শত্রুদের হত্যাকান্ডের দৃশ্য দেখে আনন্দ পেতেন। এমনকি বলা হয়ে থাকে মুমূর্ষ বন্দীর করুণ আর্তনাদই ছিল তার প্রিয় সঙ্গীত।

৩১। http:llen.wikipedia.org/widi/battle of Kosovo (1448)

৩২। ড: এম আব্দুল কাদির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭।

৩৩। *The Encyclopedia of Americana,* Vol. 3, New York, 2001, p.91.

৩৪। প্রফেসর মোহাম্মদ নুরনবী, *ইউরোপের ইতিহাস (১৭৮৯-১৯৪৫)*, অধুনা প্রকাশনা, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ২৮৪।

৩৫। মুহাম্মদ ওমর ফারুক, বাংলায় তুর্কী জাতীয় বিপ্লবের (১৯২৩) প্রভাব: একাটি পর্যালোচনা, *ইতিহাস, চল্লিশ বর্ষ*, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ- শ্রাবণ, ১৪১৩ (মার্চ ২০০৭), পৃ. ৩১।

৩৬। প্রফেসর মোহাম্মদ নুরনবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৪।

৩৭। http//:enWikipedia.org/wiki/slovodan.milosevia.

৩৮। *দি নিউজ উইক*, মে-১৯৯৫।

৩৯। *The World Book Encyclopedia* , Vol. 2, New York, 1976, p.33.

৪০। Samuel P. Huntington, *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order,* Shinion, Schuster, 1998; see also Samuel P. Huntington, 'The Clash of Civilizations', *Foreign Affairs,* Summer 1993, Vol. 72, p. 22.

দ্বিতীয় অধ্যায়

পটভূমি ও সাম্প্রতিক কালে এর কারণ সমূহ

আধুনিক ইউরোপের ইতিহাসে কসোভো স্বাধীনতা সংগ্রামের সূত্রপাত

পটভূমি ও সাম্প্রতিক কালে এর কারণ সমূহ

কসোভো বলকান মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি দেশ, প্রায় ৬০ বছর পূর্বে বলকান অঞ্চলের বিশাল এক অংশ অটোমান তুর্কী সাম্রাজ্যভূক্ত হয়, ত্রয়োদশ শতকের শেষ দিকে আনাতুলিয়াকে কেন্দ্র করে ওসমানীয় যে অটোমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে তার কিছুদিনের মধ্যে এটা একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্যে পরিণত হয় এবং ইউরোপে সাম্রাজ্য বিস্তার শুরু করে, ২৮ জুন ১৩৮৯ সালে প্রথম কসোভোর যুদ্ধ সংগঠিত হয় এবং কিংবদন্তির এ যুদ্ধে ওসমানীয় সুলতান প্রথম মুরাদের সময় তাঁর পুত্র বায়েজিদের নেতৃত্বে সার্বিয় প্রিন্স ল্যাজারের পরাজয়ের মাধ্যমে কসোভোয় তুর্কি শাসনের সূচনা করে এবং তখন থেকেই এ অঞ্চলে ইসলামের বিজয় ও বিস্তার ঘটে।[১] *The Encyclopedia Americana* গ্রন্থে বলা হয়েছে-The Turks took Adrianopole in 1365 and defeated the Serbian Empire of the Battle of Kosovo in 1389.[২]ওসমানীয় তুর্কীদের শাসন ও শোষণের ফলে বলকান অঞ্চলের জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবাদী ধারণা দানা বাঁধতে থাকে। অটোমান শাসনাধীন বলকান অঞ্চলের এ জাতীয়তাবাদী শিখা সমগ্র বলকান অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।[৩] এরই ধারাবাহিকতায় ১৮২৯-১৯০৮ সালের মধ্যে গ্রীস, মন্টিনিগ্রো, সার্বিয়া এবং রুমানিয়ার মতো স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে।১৯১২ সালের মধ্যে ওসমানীয়রা একমাত্র থ্রেস ছাড়া সমগ্র ইউরোপ থেকে বিতাড়িত হয়।[৪] এরই ফলশ্রুতিতে কসোভোর জনগণ ও জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের দিকে এগিয়ে যায়। আলোচ্য অধ্যায়ে কিভাবে কসোভোর জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগ্রত হয় এবং তা কিভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামের সূত্রপাত ঘটায় এবং এর কারণই বা কি ছিল তা আলোচনা করা হবে আলোচ্য অধ্যায়ে।

পটভূমি ও কারণ ঃ

সাম্প্রতিক কালের ইতিহাসে কসোভোর স্বাধীনতা সংগ্রাম বিশ্ব রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। আধুনিক বিশ্ব ব্যবস্থায় আন্তর্জাতিক রাজনীতি দুটি বৃহত্তর

সমীকরণে বিভক্ত পড়ে। শুরু হয় শীতল যুদ্ধ। মূলত এই শীতল যুদ্ধের বাস্তবরূপ ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ সালের তথা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের[৫] সমাপ্তির পর থেকে প্রতীয়মান হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে একটি পক্ষ থাকলেও অন্যটির নেতৃত্বে থাকে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন তথা বর্তমান রাশিয়া। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে ১৫টি স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হলে বিশ্ব রাজনীতিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব কমতে শুরু করে।[৬] যার ফলশ্রুতিতে ইউরোপের বলকান অঞ্চলসহ অন্যান্য অঞ্চল জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয় এবং নিজেদের মধ্যে স্বাধীনতা আন্দোলনের স্পৃহা জাগ্রত হয়। তারই ধারাবাহিকতায় কাঙ্খিত স্বাধীনতা লাভের আশায় বলকান অঞ্চলের কসোভোর জনগণের মনে স্বাধীনতার স্পৃহা জাগ্রত হয়। দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর এক ঐতিহাসিক ঘোষণার মধ্য দিয়ে নিজেদেরকে বিশ্ব মানচিত্রে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।

কসোভোর স্বাধীনতা সংগ্রামের পিছনে যে সমস্ত কারণগুলো নিয়ামকের ভূমিকা পালন করেছিল সেগুলো হচ্ছে জাতীয়তাবোধ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক। অপরাপর বলকান দেশগুলোর ন্যায় তাদেরও স্বাধীনতার স্পৃহা জেগেছিল। এই স্বাধীনতার স্পৃহা থেকে তাদের মনে জাতীয়তাবাদী[৭] আন্দোলনের ধারণা জন্মায়।

আধুনিক ইউরোপের ইতিহাসে বলকান একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল হিসেবে বিবেচিত। কারণ মহাযুদ্ধের সূচনাও হয়েছিল এই বলকান অঞ্চলকে কেন্দ্র করে। মেসিডোনিয়া, আলবেনিয়া, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া ও মোলদোভা নিয়ে বলকান অঞ্চল গঠিত। কিন্তু বলকান উপদ্বীপ বলতে বোঝায় দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপের ঐ অংশকে যা কৃষ্ণসাগর, ইজিয়ান সাগর, ভূমধ্যসাগর, আয়োনিয়ান সাগর এবং এ্যড্রিয়াটিক সাগর দ্বারা আবৃত।[৮] আবার বলকান রাজ্য বলতে আলবেনিয়া, বুলগেরিয়া, গ্রীস, রুমানিয়া, সাবেক যুগোস্লাভিয়া এবং তুরস্কের পশ্চিমাংশ থ্রেসকে বুঝায়।[৯] চতুর্দশ শতাব্দীতে বুলগেরিয়া (১৯৩৬) দখলের মাধ্যমে ওসমানীয় সুলতানরা বলকান অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করে। ১৪৫৩ সালে ওসমানীয় সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদ (১৪৫১-

১৪৮১) উপদ্বীপের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ কনস্টান্টিনোপল দখল করে, মহামতি সুলমায়নের (১৫২০-১৫৬৬) শাসনামলে তুর্কীরা বেলগ্রেড দখল করে।[১০] পঞ্চদশ শতকের মধ্যে বলকান অঞ্চলগুলো তুর্কীদের অধীনে চলে গেলেও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশক পর্যন্ত বলকান অঞ্চলে তুর্কী সুলতানের প্রভাব কমতে শুরু করে। এর অন্যতম কারণ বলকান জাতিগুলোর মধ্যে জাতীয়তাবোধ তৈরী হতে থাকে এবং তারা ওসমানীয় সুলতানদের শাসনমুক্ত হওয়ার জন্য তীব্র ইচ্ছা প্রকাশ করে। এর ফলশ্রুতিতে ১৯১২ সালে প্রথম বলকান যুদ্ধ ও ১৯১৩ সালে দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধের সূচনা হয় এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মধ্যে ওসমানীয় সুলতানরা কেবল তুরস্কের পশ্চিম অংশ থ্রেস ছাড়া বলকানের সমগ্র অংশ থেকে হাত গুটাতে বাধ্য হয়।

বলকান অঞ্চলের অন্যান্য দেশগুলো যেমন বসনিয়া-হারজেগোভিনা, ক্রোয়েশিয়া, মন্টিনিগ্রো একে একে স্বাধীন হতে থাকলে কসোভোর জনগণের এই জাতীয়তাবোধ তীব্র হতে থাকে এবং তারা নিজেদের স্বাধীনতা দাবী করে। ১৯90 সালে প্রথম স্বাধীনতা দাবী করলেও একমাত্র আলবেনিয়া ছাড়া অন্য কোন দেশ তাদের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেয়নি।[১১] তার পর থেকে তাদের এই জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রকট আকার ধারণ করে এবং ১৯৯৯ সালে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

বলকান অঞ্চলে মুসলমানদের শাসনের একটি সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। বলকান রাষ্ট্র এবং দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপের মুসলমানরা মূলত তুর্কী বংশোদ্ভূত, এছাড়া কিছু সংখ্যক মুসলমানরা মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য জায়গা লোক এসে ওসমানীয় শাসনামলে এ অঞ্চলে বসবাস শুরু করে। বলকান অঞ্চলে সিংহভাগ মুসলমান ধর্মান্তরিত যাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী রয়েছে আলবেনিয়া, বসনিয়া-হারেজগোবিনা ও বুলগেরিয়ায়। বর্তমান আলবেনিয়া ও কসোভো ছাড়া বলকান অঞ্চলে সব জায়গাতেই মুসলমানরা সংখ্যালঘু।[১২] এ সংখ্যালঘু মুসলমানদের নির্মূল করতে সার্বরা কসোভোর আলবেনীয়দের উপর নিপীড়ন করতে শুরু করে, সার্বরা বলে এটা জাতিগত শুদ্ধি

আয়োজন। এ শুদ্ধিকরণের নীতি বাস্তবায়নকে ত্বরান্বিত করে উগ্র জাতীয়তাবাদী সার্ব নেতা মিলোসেভিস। বলকান মুসলমানদের প্রতি তাঁর বিরূপনীতি ও নৃশংস আচরণ কসোভোর জনগণকে তাদের অধিকার সচেতন করে তোলে যা তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি অন্যতম কারণ। মিলোসেভিস বলতেন- "We believe that Serbs have the legitimate right to live in one Country. If we must fight them by God, we will fight".[১৩]

কসোভোর স্বাধীনতা সংগ্রামের পিছনে আর একটি অন্যতম কারণ হচ্ছে সামাজিক কারণ। সামাজিকভাবে কসোভোবাসী ছিল বিভিন্ন জাতিগত সম্প্রদায়ে বিভক্ত। এ সংকটের মূল বা ভেতরের কারণের উপর আলোকপাত করতে গিয়ে সমসাময়িক ইতিহাস বিশ্লেষক স্যামুয়েল পিটার হানটিংটন যথার্থই মন্তব্য করেছেন,"It is my hypothesis that the fundamental source of conflict in this new world will not be primarily ideological or primarily economic. This great divisions among humankind and the dominating source of conflict will be culture"[১৪]নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত রাষ্ট্রগুলোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাদের বহুত্ববাদী সমাজ ব্যবস্থা। মূলত একটি সমাজ তখনই বহুত্ববাদী হয় যখন তাদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ জাতিগোষ্ঠী, ভাষা, নগগোষ্ঠী, বর্ণ অনুমিত রক্তসম্পর্ক, প্রথা ও ভৌগোলিক পার্থক্য বিদ্যমান থাকে। অনেক নতুন রাষ্ট্রের জাতিগোষ্ঠীগত দ্বন্দ্ব, ভূখন্ডগত সীমানা সংক্রান্ত দ্বন্দ্বে প্রকাশ পায় এবং কখনো কখনো উপজাতীয় সীমানা অতিক্রম করে সাম্প্রদায়িকতা ও আঞ্চলিকতাবাদের চলতি সমস্যাগুলো সৃষ্টি করে যা ছিল মূলত ঔপনিবেশিক শাসনেরই সৃষ্টি। ১৯৮৯ সালে বেলগ্রেডে অসম সার্বিয় কর্তৃত্বের ফলে বেলগ্রেড নেতৃবর্গ এবং স্লোভেনিয়া ও ক্রোয়েশিয়ার প্রজাতন্ত্রসমূহের মধ্যে এক তুমুল দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এমনকি ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বরে সার্বিয়া হতে স্লোভেনিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে বাস্তব পদক্ষেপ নিতে শুরু করে। এই বিভক্তির ফলে তাদের নিজেদের সার্ব ও মুসলমানদের জাতিগত বিদ্বেষ আরো বেড়ে যায় এবং আলবেনিয়ান

জাতিগত আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল এই কসোভো। সমাজের মধ্য শ্রেণী বিভাজন ও সামাজিক অবক্ষয় তাদের আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করেছিল।

বলকান রাষ্ট্রগুলো নৃ-তাত্ত্বিক দিক থেকে একটি জটিল অবস্থানে রয়েছে। এখানে প্রায় ৬০ মিলিয়ন লোকের বাস। এই বিশাল জনগোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে অনেকগুলো নৃ-তাত্ত্বিক জাতি-গোষ্ঠী ও ধর্মের লোক। এই নৃ-তাত্ত্বিক জটিলতার কারণেই বলকান অঞ্চলে দীর্ঘদিন থেকে এক ধরণের অস্থিরতা বিরাজ করছিল। বলকান উপদ্বীপের মুসলিম অধ্যূষিত এলাকায় মোট জনসংখ্যা ১৮ মিলিয়ন। এর মধ্যে মুসলিম হলো ৬ মিলিয়ন। অন্যান্য নৃ-তাত্ত্বিক গোষ্ঠীগুলো হল সার্ব, ক্রোট, স্লাভ, আলবেনীয়, বসনিয়াক ও মেসিডোনিয়ান। এ প্রসঙ্গে পিটার ব্লাকবলেন- 'বলকান ধর্মীয় পরিচিতিই জাতীয় পরিচয় বহন করে এবং ইহা সেখানে মিথ হিসেবে পরিচিত লাভ করে'। এসব দিক বিবেচনায় সাবেক যুগোশ্লাভিয়ার কসোভো দ্বন্দ্ব দুটি বিষয়ের (যেমন জাতিগত এবং ধর্মীয়) উপর ভিত্তি করে শুরু হয় এবং কসোভোর স্বাধীনতা প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে ইহার পরিসমাপ্তি ঘটে। দেখা যায় কসোভোর ৯০ ভাগ জনসংখ্যা জাতিগত আলবেনীয়ান যারা ইলিরিয়ান হিসেবে পরিচিত ছিল। এই ইলিরিয়ান উপজাতিরা রোমান শাসনের পূর্ব থেকে এ এলাকায় বসবাস করত। তাদের ভাষা অন্য ভাষার চেয়ে আলাদা ছিল। এরা আজ কসোভো মুসলিম হিসেবে পরিচিত। কসোভোর স্বাধীনতার পেছনে ধর্মীয় এবং জাতিগত উভয় দিকটিই লক্ষ্যণীয়। কারণ সার্বরা অর্থডক্স চার্চের অনুসারী আর আলবেনিয়রা ইসলাম ধর্মের অনুসারী।

সার্বিয়ান শাসকদের অন্যায় ও অনৈতিক শাসনের বিরুদ্ধে নির্যাতিত মুসলিমগণ তাদের নিজেদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় সোচ্চার হয় এবং সার্বিয়ার বিরুদ্ধে নিজেদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে কসোভো লিবারেশন আর্মি গঠন করে আন্দোলন চালিয়ে যায়। সার্বিয় বাহিনী এই নিরাপরাধ মুসলমানদের হত্যাযজ্ঞ মেতে উঠে। বলা হয়ে থাকে ধর্মের কারণে সার্ব বাহিনী তাদের অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। কসোভোর জনগণের একমাত্র দোষ হচ্ছে তারা মুসলমান ধর্মাবলম্বী। এ কারণেই নিরাপরাধ মুসলমানদেরকে তারা নির্বিচারে হত্যা করেছে।

যুগোস্লাভিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট জোসেফ ব্রোঞ্জ মার্শাল টিটো ১৯৮০ সালে মৃত্যু বরণ করেন এবং তার মৃত্যুর পরবর্তী সময়ে দেশ পরিচালনার যোগ্য উত্তরসূরি না পাওয়ায় যুগোস্লাভিয়া ফেডারেশন দূর্বল হতে থাকে। এক পর্যায়ে ফেডারেশন থেকে ভেঙ্গে ফেডারেশন ভুক্ত দেশ গুলো স্বাধীন হতে থাকলে কসোভো ও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। এক পর্যায়ে এসে তাদের স্বাধীনতার দাবি ঘোষণা করে।

কসোভোর স্বাধীনতা সংগ্রামের পিছনে আরো একটি বড় কারণ ছিল অর্থনৈতিক কারণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য অর্থ যোগানকারী প্রতিষ্ঠান গুলো যুগোস্লাভিয়ায় ধর্মীয় ও উৎপত্তিগত জাতীয়তার ভিত্তিতে ভাঙ্গনকে প্রভাবিত করে ফলে কসোভোর জনগণের উপর প্রভাব বিস্তার করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে যুগোস্লাভিয়ার উত্তরাংশে শিল্প উন্নয়ন হলেও এর কাঁচামাল যোগানকারী ছিল দক্ষিণ অঞ্চল। কাঁচামালের দাম কমে যাওয়াতে এই সকল অঞ্চলের মধ্যে তীব্র অর্থনৈতিক বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। ফলশ্রুতিতে শিল্পোন্নত উত্তর অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে স্বাধীনতার স্পৃহা সৃষ্টি হয়।

International Monetory Fund (IMF)[১৫] কসোভোর ব্যাপারে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলক বাজারের সাথে তাল মিলিয়ে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে যেমন মূল্যহ্রাস, মজুরী নির্ধারণ। কিন্তু IMF এর হস্তক্ষেপ করার কারনে কেন্দ্রীয় সরকারের রেভিন্যু (Revenue) কমে যায় যার ফলে বাজেট ব্যালেন্স করার জন্য প্রদেশের উপর চাপ প্রয়োগ করে। ফলে অর্থনৈতিক অবস্থা ভেঙ্গে পড়ে এবং জাতিগত বিদ্বেষ প্রকট রূপধারণ করে।

উনবিংশ শতাব্দীতে বলকান অঞ্চলে জাতীয়তাবাদের মনোভাব সৃষ্টি হওয়ার ফলে তাদের নিজেদের সার্ব ও মুসলমানদের জাতিগত বিদ্বেষ আরো বেড়ে যায় এবং আলবেনিয়ান জাতীয়তাবাদের কেন্দ্রবিন্দু ছিল এই কসোভো।

১৮৭৮ সালে League of Pritzen গঠিত হয়। এটি একটি রাজনৈতিক সংস্থা ছিল। অটোমান সাম্রাজ্যের সকল আলবেনিয়ানদের একত্রিত করার জন্য এই রাজনৈতিক সংগঠনের

জন্ম হয়। সাধারণভাবে ওরা অটোমান সাম্রাজ্যের স্থিতিশীলতা চায় তবে তা তাদের অধিকার রক্ষার সুযোগ থাকা সাপেক্ষে। ১৮৮১ সালে এই সংগঠনের পতন ঘটে কিন্তু এটি আলবেনিয়ানদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করে যায়। এ কথা স্পষ্ট যে সার্বিয়ানদের সাথে আলবেনিয়ানদের মতের মিল কোন দিনই হয়নি। সার্বিয়ান সাম্রাজ্যের অভিপ্রায় ছিল এই অঞ্চলটি আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হোক। কসোভোর বর্তমান অবস্থার মূল নিয়ামক ছিল যুগোস্লাভিয়ার প্রদেশগুলোর মধ্যে অন্তর্বিভেদ। বিশেষভাবে ১৯৯৮ ও ১৯৯৯ সালের কসোভো যুদ্ধে যদিও বলকানদের জাতীয়তাবাদের উন্মেষকে প্রধান নিয়ামক হিসেবে ধরা হয়।

১৩৮৯ কসোভো যুদ্ধে অটোমান সৈন্যরা সার্বিয়ান, আলবেনিয়ান ও বসনিয়ান সম্মলিত বাহিনীকে পরাস্ত করে এবং সাধারণত কিছু অংশ তুর্কী শাসন মেনে নেয় এবং ল্যাজারের মেয়েকে বিয়ে করে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এবং ১৪৪৫ সালের মধ্যে পুরোপুরিভাবে অটোমান সাম্রাজ্যের অধীনে চলে আসে।

কসোভোর স্বাধীনতা সংগ্রামের পেছনে কাজ করেছে সেদেশের জনগণের স্বাধীনতার ইচ্ছা। কসোভোর জনগণের দীর্ঘদিনের স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্খা। কসোভোর জনগণ ও সাবেক যুগোস্লাভিয়ার জন্য রিপাবলিকগুলোর মতো স্বাধীন হয়ে যেতে চায়। কিন্তু স্লোভেদান মিলোসেভিচ চাননি কসোভো তাদের আলাদা অস্তিত্ব নিয়ে স্বাধীন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করুক। এক সময় যুগোস্লাভিয়া রাষ্ট্রের যে অস্তিত্ব ছিল সেই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব আজ নেই বললেই চলে। মোট ৬টি রিপাবলিক ও ২টি স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ নিয়ে যুগোস্লাভিয়া ফেডারেশন গঠিত হয়েছিল। ১৯৪৪ সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জোসেফ ব্রোজ টিটো গেরিলা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে যুগোস্লাভিয়ার রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করলেও যুগোস্লাভিয়ার জন্ম মূলত অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয়ান সাম্রাজ্যের পতনের মধ্য দিয়ে ১৯১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে হয়। এই যুগোস্লাভিয়ার দীর্ঘ

ইতিহাস জুড়ে আছে সার্ব আর ক্রোটদের ভেতরকার বৈরিতা, শত্রুতা আর দ্বন্দ্বের কথা। এখানে এক প্রদেশের ভাষা সংস্কৃতি আর জীবনধারার সাথে অন্য প্রদেশে কোন মিল ছিলনা।

সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পূর্ব-ইউরোপের দেশগুলোতে সমাজতন্ত্রের পতনের সাথে সাথে যুগোশ্লাভিয়ার সমাজতন্ত্র নড়বড়ে হয়ে উঠে। প্রথম সুযোগেই ফ্রাঞ্জো তুজমাল (মৃ. ১৯৯১) এর নেতৃত্বে ক্রোয়েশিয়া ১৯৯১ সালের ২৫শে জুন স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং পশ্চিম বিশ্বের স্বীকৃতিলাভ করে এর পর মেসিডোনিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেও পাশ্চাত্যের স্বীকৃতি পায়নি। এখানে উল্লেখ্য যে, একই সময়ে স্লোভেনিয়া ও স্বাধীনতা লাভ করে। সার্বিয়া যুগোশ্লাভ ফেডারেশনকে টিকিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে।

উল্লেখ্য যে, কমিউনিষ্ট শাসনামলে ফেডারেশনে সকল জাতি গোষ্ঠীর সমান অধিকার থাকলেও সরকারের প্রশাসন ও সামরিক বাহিনীতে সর্বত্রই সার্বদের প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি ছিল। সার্বদের প্রাধান্যকে কেন্দ্র করেই যুগোশ্লাভিয়ার নামকরণ।

স্বাধীনতা সংগ্রামের সূত্রপাত

মুসলিম বিশ্বের ইতিহাস বিশেষ করে আধুনিক ইউরোপের বলকান[১৬] অঞ্চলের মুসলমানদের রাজনৈতিক ইতিহার পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বলকান রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে কসোভো বরাবরের মতই একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছিল। উল্লেখ্য প্রথম কসোভো বিজয় করেন মুসলমানরা ১৩৮৯ সালের ২৮ জুন।[১৭]

আশির দশকের শেষ দিকে যখন পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট শাসন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ছিল পশ্চিমা বিশ্বের পুঁজিবাদ শক্তি তখন থেকেই তাদের ভবিষ্যৎ ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে যেন ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সম্ভবতঃ সে কারণেই মানবিক নীতিবোধ তখন তাদের একেবারেই ছিল না। পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট দেশগুলি তখন যেন এক একটি বলির পাঁঠা। যন্ত্রটির যথাসম্ভব যন্ত্রনা মুক্ত মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করার সময় তখন যেন তাদের আর ছিল না। মৃত্যু যন্ত্রনায় হাত পা

ছুঁড়তে থাকা পশুটির দেহের সব লোভনীয় অংশ নিয়ে তখন সবাই টানাটানিতে ব্যস্ত। ই-ই-সি-এর নৈশভোজে টেবিলে কী কায়দায় পূর্ব ইউরোপকে পরিবেশন করা হবে, তাই ছিল তখনকার মুখ্য আলোচ্য বিষয়।

পশ্চিমা পাক প্রণালিতে আহার্য্য আমিষ জাতীয় খাদ্য কোন প্রণালিতে পাক হবে তার মুখ্য বিষয় প্রাণীদেহের যে অংশবিশেষ খাওয়া হবে, তার যথারীতি কর্তন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা। এ ক্ষেত্রে কসাই একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অবস্থার দৃষ্টে মনে হয় এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজটির জন্য যুগোস্লাভিয়ার ক্ষেত্রে মিলোসেভিচই ছিলেন ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি।

মিলোসেভিচের[১৮] প্রাথমিক পরিকল্পনা ছিল আস্ত একটি 'যুগোস্লাভ রোষ্ট' এর আয়োজন করা। তিনি চাচ্ছিলেন কমিউনিস্ট শাসনের শৃঙ্খলে বাঁধা যুগোস্লাভ ফেডারেল রাষ্ট্র কাঠামোর কেন্দ্রীয় সরকারকে কব্জা করে অন্যান্য প্রজাতন্ত্রগুলির ওপর একটি ছদ্মবেশী সার্ব আধিপত্য বিস্তার করতে, যেটা নামে মাত্র হবে যুগোস্লাভিয়া, কিন্তু কার্যত হবে সার্বস্লাভিয়া।

এই ব্যবস্থা ব্যর্থ হলে বিকল্প হিসেবে তিনি ঠিক করে রেখেছিলেন খোদ সার্বিয়ার আয়তনকে যথা সম্ভব বিস্তৃত করে নিয়ে 'বৃহত্তর সার্বিয়া'-র প্রতিষ্ঠা করা। 'বৃহত্তর সার্বিয়া'- ছিল, 'সার্বস্লাভিয়া'-র বিকল্প ব্যবস্থা। এ ক্ষেত্রে তার কৌশল ছিল অন্যান্য প্রজাতন্ত্রগুলিতে বসবাসরত 'সার্ব' দেরকে বিদ্রোহে অনুপ্রাণিত করে, বিদ্রোহ দমন, শান্তি স্থাপন ও সর্বোপরি যুগোস্লাভিয়ার আঞ্চলিক অখন্ডতার রক্ষার অজুহাতে, সার্ব অধ্যূষিত 'যুগোস্লাভ পিপলস আর্মি' বা যে, এন, এ-এর দ্বারা এলাকাটিতে সার্বিয়ার অন্তর্ভূক্ত করা।

অন্যান্য প্রজাতন্ত্রগুলিতে বসবাসরত সার্বদেরকে বিদ্রোহে টেনে নামানোর উদ্দেশ্যে তিনটি উপ-কৌশল অবলম্বন করা হয়। প্রথম উপ-কৌশলটি ছিল, মিলোসেভিচের নিয়ন্ত্রনাধীন এবং 'সার্বিয়ান একাডেমি অব সায়েন্সেস'-এর লাগাতার অপপ্রচারের মাধ্যমে অন্যান্য প্রজাতন্ত্রে বসবাসরত 'সংখ্যালঘু' সার্বদেরকে আতঙ্কিত করে তোলা। দ্বিতীয় উপ-কৌশলটি ছিল, অন্যান্য

প্রজাতন্ত্রে পুলিশ বাহিনীর উপর হামলা চালিয়ে দুই একজন পুলিশকে হত্যা করা, এবং তারপর এলাকাবাসীদের মাঝে প্রজাতন্ত্রের সরকারী বাহিনীর পাল্টা হামলার আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়ে, 'প্রতিরোধ'-এর নামে স্থানীয় জনগণের মাঝে অস্ত্র বিতরণ করা। এই অস্ত্র বিতরনের কাজে সার্ব অফিসার অধ্যূষিত যুগোস্লাভ ন্যাশনাল আর্মির স্থানীয় কমান্ডারগণ মুখ্য ভূমিকা পালন করতেন। তারপর প্রজাতন্ত্রের পুলিশ বাহিনীর অভিযান শুরু হবার সাথে সাথেই তাদের সাথে বন্দুকযুদ্ধ শুরু করা। এই তথাকথিত প্রতিরোধ যুদ্ধ ছিল উপ-কৌশলের তৃতীয় পর্যায়। তার মহাপরিকল্পনাটি ছিল মূলতঃ আমলাতান্ত্রিক, যার বিকল্প হিসেবে রাখা হয়েছিল সামরিক ব্যবস্থা। সমগ্র যুগোস্লাভিয়া জুড়ে বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রের একই নীল নকশা অনুযায়ী কাজ হয়েছে। অথচ 'শান্তির দূত'-পশ্চিমা পুঁজিবাদী গণতন্ত্রীরা সবকিছু জেনে বুঝে বরাবর না বোঝার ভান করে এসেছে।

কসোভো, ভজভোদিনা এবং মন্টিনিগ্রোতে অবলম্বন করা হয় প্রথম কৌশল, অর্থ্যাৎ যুগোস্লাভ ফেডারেল রাষ্ট্র কাঠামোর কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতায় সম্প্রসারণ। ক্রোয়েশিয়া ও বসনিয়ার ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয় দ্বিতীয় কৌশল, অর্থ্যাৎ 'সার্ব বিদ্রোহ'-এর কৌশল।[২০]

কসোভো ছিল মিলোসেভিচের রাজনৈতিক উত্থানের প্রথম ও প্রধান মঞ্চ। এখানে দেখা যায় উগ্র সার্ব জাতীয়তাবাদের যুগকাষ্ঠে তিনি যুগোস্লাভ ফেডারেল সরকারকেও বলিদান করেছেন। যুগোস্লাভ ফেডারেল রাষ্ট্র কাঠামো ও তার কেন্দ্রীয় সরকার প্রকৃত পক্ষে ছিল মিলোসেভিচের হাতে একটি অস্ত্র বিশেষ, যা তিনি ক্রমান্বয়ে ব্যবহার করে যাচ্ছিলেন অন্যান্য প্রজাতন্ত্রগুলির বিরুদ্ধে। অথচ পশ্চিমা মানবাধিকারবাদীরা 'যুগোস্লাভিয়া আঞ্চলিক অখন্ডতা'- রক্ষার নামে তার সমস্ত অপকর্মগুলিকে সমর্থন করে যাচ্ছিলেন। মিলোসেভিচের প্রথম শিকারটি ছিল তাদের কাছেও সমান লোভনীয়। ১৯৮৭ সালের এপ্রিল মাসে সার্বিয়া প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট জনাব স্টামবোলীচ[২১]তার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল তার দীর্ঘ দিনের পুরনো বন্ধুকে বিশ্বাস করে ঐ মাসের ২৪ তারিখে তিনি সার্বিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি প্রেসিডেন্ট মিলোসেভিচকে পাঠালেন,

কসোভোর আলবেনিয় মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত পার্টি প্রধানের বিরুদ্ধে স্থানীয় সার্ব ও জনগোষ্ঠীর বিক্ষোভের মধ্যস্থতা করতে। কসোভোর সার্ব জনগোষ্ঠীর বিক্ষোভ যে একটি নীল নকশার অংশ, এবং তার বন্ধু মিলোসেভিচ যে এই নীল নকশার অন্যতম প্রণেতা, যা স্টামবোলীচ ঘুনাক্ষরেও জানালেন না। ইভান স্টামবোলিচ অবশ্য ১৯৮৬ সালে এপ্রিল মাসে কসোভো সফরে গিয়েছিলেন, কিন্তু তার সফর স্থানীয় সার্বদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। আজীবন কমিউনিস্ট মতাদর্শে লালিত স্টামবোলিচ উগ্র সার্বজাতীয়তাবাদের মাঝে যুগোস্লাভিয়ার ধ্বংসের বীজ দেখতে পেয়েছিলেন। যদিও মিলোসেভিচ ও স্টামবোলীচ এর সার্বিয়া, কসোভো এবং ভজবোদিনা স্বায়ত্ত্ব শাসণ সর্ম্পকে একই মতামত ছিল।

পরের বছর ঘনিষ্ঠ বন্ধু মিলোসেভিচকে কসোভোতে পাঠানোর পূর্বে তিনি বন্ধুকে মাথা ঠান্ডা রাখার পরামর্শ দিয়েছিলেন, কিন্তু কমিউনিস্ট সার্বিয় প্রেসিডেন্ট হয়ত জানতেন না, যে এর চারদিন পূর্বেই গোপনে তার বন্ধু কসোভো ভ্রমণ করে যাবতীয় আয়োজন শেষ করে এসেছেন। শুধু তাই নয়, মিলোসেভিচের ২৪শে এপ্রিলের সফরের পূর্বে তিনি শলোভিচ নামক জনৈক নেতাকে কসোভোতে সমস্ত আয়োজনে সার্বিক তত্ত্বাবধায়নের জন্য পাঠিয়েছিলেন। 'সার্বিয় একাডেমি অব সায়েন্সেস' এর বুদ্ধিজীবিরা তখন বহিস্কৃত কমিউনিস্ট নেতা ডারবিকা চসিচ-এর নেতৃত্বে গোটা সার্ব জাতীর মন মানসিকতার নেতৃত্ব দিচ্ছেন, যার সাথে যোগ দিয়েছে এই প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত বিভিন্ন মিডিয়া কর্মকর্তাগণ। মিলোসেভিচের কসোভো সফর 'কভার' করার জন্য বেলগ্রেড টেলিভিশনের বিশেষ টিম তার অনুগামী হলো, অথচ নিয়ম অনুযায়ী এই অনুষ্ঠানটিকে কভার দায়িত্ব ছিল কসোভো প্রাদেশিক টেলিভিশনের। স্টামবেলিচ তখনও বুঝতে পারেন নি যে, তার পায়ের নিচ থেকে মাটি সরতে শুরু করেছে। সার্বিয় একাডেমি অব সায়েন্সেস উগ্র জাতীয়তাবাদী মেমোরেন্ডা- এর বিরোধীতা করে ইতোমধ্যে স্টামবেলিচ ও বেলগ্রেড পার্টি প্রধান পাভলোভিচ রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলেন। সমগ্র সার্বজাতি ত্রাণকর্তা হিসেবে তখন মিলোসেভিচ পিছন থেকে উঠে এসে তার পিঠে ছুরিকাঘাত

করতে উদ্যত। অথচ সেই মিলোসেভিচকেই তিনি পাঠালেন কসোভোর সংকট নিরসনের উদ্দেশ্য।

২৪শে এপ্রিল মিলোসেভিচ কসোভোতে পৌঁছবার পূর্বেই সেখানে সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছিল। এটা ছিল নিতান্তই একটি 'স্টেজ শো'। হাজার হাজার সার্ব বিক্ষোভকারী পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক কসোভোর আলবেনিয় মুসলমান পার্টি প্রধানের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল। কসোভো পার্টি প্রধান আজম ভাসী ঘুর্নাক্ষরেও জানালেন না কমরেড মিলোসেভিচের আসল উদ্দেশ্য। তিনি আশা করেছিলেন মিলোসেভিচ স্থানীয় সার্বদেরকে নিরস্ত্র করতে সক্ষম হবেন। সমবেত বিক্ষোভ কারীদেরকে 'শান্ত' করার জন্য অবশেষে মিলোসেভিচ পার্টি অফিসের ঝুল বারান্দায় দাড়ালেন। সমবেত সার্ব বিক্ষোভকারীরা প্রাণভরে দেখলেন তাদের আরোগ্য ত্রাণকর্তার চেহারা। পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী মূহর্মূহ হর্ষধ্বনির মাঝে স্থানীয় পার্টির নেতাদেরকে হতবাক করে নিয়ে মিলোসেভিচ সার্ব বিদ্রোহের আগুনে ঘৃতাহুতি দিলেন। তিনি ঘোষণা করলেন 'তোমরা এগিয়ে চলো' কেউ তোমাদের দমিয়ে রাখতে পারবে না। বেলগ্রেড টেলিভিশন থেকে এই ঘোষণা বারবার প্রচারিত হতে লাগল। রাতারাতি মিলোসেভিচ হয়ে উঠলেন সমগ্র সার্বজাতীর নেতা কমিউনিস্ট থেকে উগ্রজাতীয়তাবাদী। 'সার্বিয় একাডেমি অব সায়েন্সেস' এর ভাবাদর্শে লালিত বেলগ্রেড মিডিয়া জগত রাতারাতি মিলোসেভিচকে প্রতিষ্ঠিত করল রাজনৈতিক 'সুপারস্টার' এর মর্যাদায়। ১৯৮৭ সালের ১৬ই জুন কসোভো সংকট আলোচনার জন্য যুগোস্লাভ কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভা আহ্বান করা হলো। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী বেলগ্রেড শহর ঐদিন বিক্ষোভের পীঠস্থানে পরিমিত হলো। তিন হাজার কসোভো সার্ব সভাস্থলকে ঘিরে কসোভোর স্বায়ত্ব শাসন বাতিলের দাবী জানাল। মিলোসেভিচের প্রচন্ড চাপের মুখেও ঐদিন স্টামবেলিচ ১৯৭৪এর সংবিধানের প্রশ্নে অটল রইলেন। ১৯৮৭ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর মধ্য সার্বিয়ার এক সামরিক প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে আজিজ কেলমেনদি নামক জনৈক কসোভোর শিক্ষানবিশ সৈনিক তার চারজন সহকর্মী সৈনিককে গুলি করে হত্যা করে বলে খবর প্রচারিত হয়। যাদের মাঝে ছিল দুজন মুসলমান,

একজন সার্ব ও একজন ক্রোয়াট। এর কিছুক্ষণ পরেই আজিজ কেলমেনদির মৃতদেহ আবিস্কৃত হয় প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের অদূরে। যুগোস্লাভ কর্তৃপক্ষ আজিজের মৃত্যুর ঘটনাটি আত্মহত্যা বলে প্রচার করলেন। কিন্তু সার্ব প্রচার মাধ্যমগুলি এই ঘটনাকে কসোভোর মুসলিমদের আগ্রাসন বলে প্রচার করতে শুরু করলেন। নিহত সার্ব শিক্ষানবিশ শহীদের মর্যাদায় ভূষিত হলেন। তার পিতার শত অনুরোধ উপেক্ষা করে মৃতদেহটি নিয়ে বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হলো। মিলোসেভিচ আবার উঠে এলেন সংবাদপত্রের হেডলাইনে এবং বেতার টেলিভিশনের সংবাদ শিরোনামে। নামোল্লেখ না করে বেলগ্রেড পার্টি প্রধান পাবলোভিচ বেলগ্রেড মিডিয়া প্রধানদেরকে এক ব্রিফিং সভায় আমন্ত্রণ করে মিলোসেভিচের অশুভ তৎপরতা সম্পর্কে সাবধান করে দিলেন। এই ব্রিফিং অনুষ্ঠান দেশব্যাপী প্রচারিত হলো। কিন্তু এরফল হলো হিতের বিপরীত। তবে ফল যাই হোক না কেন, এতে অন্তত বিশ্বের সামনে প্রমান হয়ে যাওয়া উচিৎ ছিল যে, যুগোস্লাভ ফেডারেল সরকার এবং খোদ সার্বিয়া প্রজাতন্ত্র সরকার মিলোসেভিচের সাথে এক লাইনে চলছিল না। মিলোসেভিচ গংই যে যুগোস্লাভিয়াকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে, পশ্চিমা পুঁজিবাদ এই সামান্য সত্যিটিকেও যে উপলব্ধি করতে পারছিলেন না। কারণ অতি স্পষ্ট, কমিউনিস্ট যুগোস্লাভিয়া ধ্বংসের মাঝে তাদের স্বার্থ ছিল। কসাইকে তো কাজ করতে দিতে হবে।

এর ঠিক দু'দিন পরে বহুল প্রচারিত 'পুলিটিকা এক্সপ্রেস' পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধে পাভলোভিচকে জাতীয় গাদ্দার বলে আখ্যায়িত করা হয়। হতবাক সার্বিয় প্রেসিডেন্ট স্টামবোলিচ বহু চেষ্টা করেও কোন দৈনিকের সম্পাদককে পলিটিকা এক্সপ্রেসের সম্পাদকীয় বিরোধীতা করতে রাজি করাতে পারলেন না। অবশেষে বাধ্য হয়ে তিনি যুগোস্লাভ পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভা আহ্বান করলেন। সভার ৪৫ জন বক্তার প্রায় সবাই পালভোভিচ এর সমর্থনে তাদের বক্তব্য পেশ করলেন। পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে মিলোসেভিচ গং সার্বিয় সেন্ট্রাল কমিটির সভা আহ্বান করলেন। ১৮ই সেপ্টেম্বর সার্বিয় সেন্ট্রাল কমিটির দুই দিন ব্যাপী সভার উদ্বোধন করা হল। সার্বিয় পার্টি প্রধান হিসেবে মিলোসেভিচ স্বয়ং এখানে সভাপতিত্ব করেন।

পাভলোভিচ ও মিলোসেভিচের মাঝে সমঝোতা করিয়ে দেবার জন্য স্টামবোলিচ যথাসাধ্য চেষ্টা করেন, কিন্তু বল নিজের আয়ত্বে পেয়ে মিলোসেভিচ আপোষের সমস্ত পথ বন্ধ করে দেন। সারা রাত্রি ধরে আলোচনা সমালোচনা চলতে থাকে। সমগ্র পূর্ব ইউরোপ জুড়ে তখন কমিউনিজম এর মৃত্যুঘন্টা বাজছে। সার্বিয় নেতাদের বুঝতে মোটেই অসুবিধে হয়নি যে, পশ্চিমা পুঁজিবাদের টাকার থলে কোন দিকে ঝুলছে। পরের দিন ভোটের মাধ্যমে পাভলোভিচকে সার্বিয় পাটি থেকে বহিস্কার করা হল। বহিস্কার প্রস্তাবের বিপক্ষে মাত্র চারটি ভোট পড়ে, যার একটি ছিল কসোভো পার্টি প্রধান আজম ভাসীর। কালবিলম্ব না করে মিলোসেভিচ গং সার্বিয় কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অষ্টম অধিবেশন আহ্বান করে। অধিবেশনের পুরো কার্য প্রণালী আগে থেকেই প্রস্তুত করা ছিল। এই প্রথমবারে মত কেন্দ্রীয় কমিটির রুদ্ধদ্বার অধিবেশন জাতীয় টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচার করা হল। সমগ্র জাতি সাগ্রহে অবলোকন করল মিলোসেভিচের বিজয় অভিযান। দুই মাস ব্যাপী অদৃশ্যে অবস্থানের পর ১৯৮৭ সালের ১৪ই ডিসেম্বর স্টামবোলিচকে সরকারিভাবে পদচ্যুত বলে ঘোষণা করা হল। 'সার্বিয়ান লীগ অব কমিউনিস্টস'-এর চূড়ান্তক্ষমতার অধিকারী হয়ে মিলোসেভিচ এবার তার নীল নকশা বাস্তবায়নের কাজে অগ্রসর হলেন।

তার আক্রমণের প্রথম কৌশল অর্থ্যাৎ যুগোস্লাভ ফেডারেল রাষ্ট্র কাঠামোর কেন্দ্রীয় শক্তিকে হাতে নিয়ে তিনি প্রথমেই সার্বিয়ার দুইটি প্রদেশ, তথ্য কসোভো এবং ভজভোদিনার উপর চড়াও হলেন। আমরা আগেই দেখেছি ভজভোদিনার পলিটব্যুরো অতি সহজেই মিলোসেভিচের করায়ত্ব হয়েছিল। তবে এখানেও কসোভো ষ্টাইলে একটি গণ বিক্ষোভোর আয়োজন করা হয়, যার পুরো দায়িত্ব ছিলেন ১৯৮৭ সালের ২৪শে এপ্রিলের কসোভো নাটকের নেপথ্য সংগঠক মিরোস্লাভ সলোভিচ। এর পর আসে যুগোস্লাভিয়ার ক্ষুদ্রতম প্রজাতন্ত্র মন্টিনিগ্রোর পালা। অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু এই প্রজাতন্ত্রটির জনগণ ছিল মূলতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। এদের অর্ধেক, যারা নিজেদেরকে সবুজ বলে আখ্যায়িত করত। তারা ছিল পরিপূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষপাতী। বাকি সাদা অংশ যারা নিজেদেরকে সার্ব বলে দাবি করত, তারা ছিল সার্বিয়ার সাথে মিশে যাবার

পক্ষপাতী। মিলোসেভিচের পূর্ব পুরুষেরাও ছিলেন মন্টিনিগ্রোর আদি বাসিন্দা। অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু মন্টিনিগ্রোর জনগণ অতি সহজেই বেলগ্রেড প্রচার মাধ্যমগুলির শিকারে পরিণত হয় এবং স্থানীয় প্রজাতন্ত্র সরকার অতি সহজেই নতি স্বীকার করে। মাত্র ৩৪ বৎসর বয়স্ক বুলটোভিচ মন্টিনিগ্রোর নতুন পার্টি প্রধান হয়ে মিলোসেভিচের পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায় থাকেন।

যুগোস্লাভ কমিউনিষ্ট পার্টির কাছে এতদিনে পরিস্কার হয়ে যায় যে, যুগোস্লাভিয়ার মাটিতে একটি রাজনৈতিক ফ্রাঙ্কেনষ্টাইনের জন্ম হতে চলেছে। দেরিতে হলেও, তারা এবার মিলোসেভিচের রাশ টেনে ধরবার চেষ্টা করেন। মিলোসেভিচের এক সময়কার সমর্থক, যুগোস্লাভ ফেডারেল পার্টি প্রধান ক্রোয়েশিয়ার ষ্টাইপ শুভার ১৭ই নভেম্বর 'যুগোস্লাভ লীগ অব কমিউনিষ্টস'-এর সপ্তদশতম অধিবেশনে কেন্দ্রীয় পলিট ব্যুরোর সদস্য পদ থেকে অনাস্থা ভোটে মিলোসেভিচকে বহিস্কার করার প্রয়াস পান। এই ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হলে ছয়টি প্রজাতন্ত্রের সদস্যদের অধিকাংশের ভোটে মিলোসেভিচকে কেন্দ্রীয় পলিট ব্যুরো থেকে বিদায় নিতে হত, যার ফলে তিনি তার প্রথম কৌশল অর্থ্যাৎ প্রজাতন্ত্রগুলির উপরে ফেডারেল রাষ্ট্র কাঠামোর কেন্দ্রীয় শক্তি সজ্জাকে আর কাজে লাগাতে পারতেন না। পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে ফেডারেল পার্টির সার্বিয় প্রতিনিধি ডুশান চেকরোভিচ প্রতিবাদ উত্থাপন করে বলেন যে, মিলোসেভিচ সার্বিয় পার্টি প্রধানের পদমর্যাদার ভিত্তিতে ফেডারেল পলিটব্যুরোর সদস্য সুতরাং তার বিরুদ্ধে কোন অনাস্থা আনার অধিকার ফেডারেল পলিটব্যুরোর অন্যান্য প্রজাতন্ত্রের সদস্যদের থাকতে পারে না। আইনগতভাবে তার যুক্তি যথার্থ ছিল। সুতরাং যুগোস্লাভ ফেডারেল পলিটব্যুরোকে কাঁচকলা দেখিয়ে মিলোসেভিচ তাদের নাগালের বাইরে চলে গেলেন। মিলোসেভিচের হাতে দুটি তাসই রয়ে গেল; প্রয়োজনবোধে অন্যান্য প্রজাতন্ত্রগুলির উপর কেন্দ্রীয় পলিটব্যুরোর ক্ষমতাকে ব্যবহার করা আবার বেকায়দায় পড়লে কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তের উপর সার্বিয় প্রজাতন্ত্রের স্বাতন্ত্রকে চাপিয়ে দেওয়া। এভাবে যুগোস্লাভ ফেডারেশনের বৃহত্তম জাতিসত্তাটি অন্যান্য জাতিসত্তাগুলির আতঙ্কিত চোখের সামনে ভয়ঙ্করতম জাতিসত্তায় পরিণত হতে চললো।

তাদের সামনে মাত্র দুটি পথ খোলা রইল, হয় 'সার্বোস্লাভিয়া'-কেই যুগোস্লাভিয়া হিসেবে মেনে নাও, নইলে বৃহত্তম জাতিটির সাথে লড়াই করো। উভয় দিক থেকেই পুরনো ফেডারেল যুগোস্লাভিয়াকে রক্ষা করার আর কোন পথই মিলোসেভিচ গং খোলা রাখলেন না।

মিলোসেভিচ এবার সার্ব প্রধান বেলগ্রেড প্রশাসনকে নতুন করে গড়ে নিলেন। যুগোস্লাভ ফেডারেল প্রশাসনে সার্বদের প্রাধান্য বরাবর থাকলেও তাদের সবাই মিলোসেভিচপন্থী ছিলেন না। কেন্দ্রীয় পলিটব্যুরোর হাতগলে বেরিয়ে এসেই তিনি সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি 'সার্বিয় একাডেমি অব সায়েন্সেস' এর আদর্শে উজ্জীবিত চসিচপন্থীদের দ্বারা পূরণ করলেন। ষ্টামবোলিচ-পাভলোভিচ প্রজন্মকে তিনি যুগোস্লাভ প্রশাসন থেকে চিরতরে বিদায় করে দিলেন। দেশের বৃহত্তম প্রজাতন্ত্রর প্রশাসনে এবং যুগোস্লাভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেড যুগোস্লাভপন্থীদের আর কোন স্থান রইল না।

অধিকতর শক্তিশালী মিলোসেভিচ এবার আবার দৃষ্টি ফেরালেন তার রাজনৈতিক উত্থানের মৃগয়া কসোভোর দিকে। ১৯৮৮ সালের ১৭ই নভেম্বর মিলোসেভিচ সার্বিয় প্রজাতন্ত্রের পার্টি প্রধানের ক্ষমতাকে ব্যবহার করে কসোভোর পলিটব্যুরোকে পদচ্যুত করেন। ১৯ লক্ষ জনসংখ্যা অধ্যূষিত কসোভোবাসীর অধিকাংশ ছিল জাতিগতভাবে আলবেনীয় মুসলমান, যারা মিলোসেভিচের প্রশাসনিক ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে কসোভো পার্টি প্রধান আজম ভাসীর পিছনে একাট্টা হয়ে দাড়ালেন। সার্বিয় পার্টি প্রধানের ক্ষমতাকে ব্যবহারের মাধ্যমে তিনি কমিউনিষ্ট শৃঙ্খলা বিধানের পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে ছাড়লেন অথচ সেই একই নীতি তার নিজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলে তিনি সার্ব জাতিসত্ত্বাকে সামনে ঠেলে দিয়ে নিজেকে আড়াল করলেন। ১৭ই নভেম্বরের কেন্দ্রীয় পলিটব্যুরোর অধিবেশন। পরিস্থিতি ক্রমেই ঘোলাটে হয়ে এলো। কসোভোর স্বায়ত্বশাসন বাতিলের সমস্ত আয়োজন যখন পুরোদমে এগিয়ে চলেছে, বেলগ্রেডের রাজপথ যখন মিলোসেভিচ পন্থীরা পুরনো টেকনিক যুদ্ধসাজে সজ্জিত হয়ে দখল করে নিয়েছে, হাজার হাজার কসোভোবাসী তখন নভেম্বর মাসের হাড়কাঁপানো ঠান্ডাকে উপেক্ষা করে তাদের পার্টি নেতাদের

পদচ্যুতির প্রতিবাদে পাঁচদিন ধরে কসোভোর রাজধানী প্রিষ্টিনার রাজপথে অবরোধ করে রেখেছে। কসোভোর রাজপথে সেদিন সার্ব ষড়যন্ত্রকারীদের কাউকে দেখা যায়নি। কসোভোবাসীর স্বতঃস্ফুর্ত প্রতিবাদকে বেলগ্রেড প্রচার মাধ্যমগুলি পুরনো কমিউনিষ্ট ভঙ্গিমায় প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থান বলে প্রচার করে। বিভিন্ন সংবাদপত্রে ছড়িয়ে থাকা 'সার্বিয় একাডেমি অব সায়েন্সেস'-এর বুদ্ধিজীবীরা এরই মাঝে আলবেনীয় বিচ্ছিন্নতাবাদ আবিস্কার করে বসলেন। পুরনো কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রের শক্তি কাঠামোকে এবার তারা পুরোপুরি সার্বিয়ার স্বার্থে কাজে লাগাতে শুরু করলেন ১৯শে নভেম্বর বেলগ্রেড অনুষ্ঠিত হল এক মহা জনসভা। সপ্তাহব্যাপী প্রস্তুতির পর সমস্ত রাষ্ট্রীয় মিল কারখানা বন্ধ করে দিয়ে, শত শত সরকারি বাস রাস্তায় নামিয়ে, একদিনের ছুটি ও চা নাস্তার বিনিময়ে শ্রমিকদেরকে সভাক্ষেত্রে এনে হাজির করা হল। দশ লক্ষ মানুষের এক অভূতপূর্ব জামায়েতের সামনে মিলোসেভিচ ঘোষণা করলেন, কসোভো চিরকালই সার্বিয়ার এবং সার্বিয়ারই থাকবে। উগ্র সার্ব জাতীয়তাবাদী কবিতা আর গানে মুখরিত হলে বেলগ্রেডের রাজপথে।

কসোভোর স্বায়ত্তশাসনের অবলুপ্তি তখন সময়ের ব্যাপার মাত্র, যা কার্যকর হলে যুগোস্লাভিয়ার আট সদস্য বিশিষ্ট প্রেসিডেন্সীর ৪টিই যথা সার্বিয়া, ভজভোদিনা, মন্টিনিগ্রো এবং কসোভোর প্রতিনিধিত্ব মিলোসেভিচের পকেটস্থ হয়। পঞ্চম দুর্বল প্রজাতন্ত্র মেসিডোনিয়াকে এক ধমকে নিজের পকেটে পুরতে পারবেন বলে মিলোসেভিচ দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করতেন। অবস্থা দৃষ্টে স্লোভিনিয়ার পার্টি প্রধানকুচান মন্তব্য করেন, যুগোস্লাভিয়াএবার সত্যিই 'সার্বোস্লাভিয়ায়' পরিণত হতে চলেছে। রাজপথ এবং প্রশাসন উভয়ই তখন মিলোসেভিচের করায়ত্ত। কুচার এর এই সমায়োচিত উপলব্ধি পরবর্তীতে স্লোভেনিয়াকে এক ভয়ঙ্কর পরিণতি থেকে রক্ষা করতে পেরেছিল। অবশ্য কসোভো একটি স্বতন্ত্র প্রজাতন্ত্র ছিল না, ছিল সার্বিয়া প্রজাতন্ত্রের একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ মাত্র। কসোভোবাসীর জন্য কোন শাসনতান্ত্রিক বা প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। নিয়মতান্ত্রিক পথে যেটুকু তারা এগুতে পারতেন, ইতোমধ্যে তিনজন

দালাল আলবেনীয়কে স্থানীয় পার্টি নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত করে মিলোসেভিচ সে পথও রুদ্ধ করে দিয়েছিলেন। অগত্যা রাজপথ ছাড়া কসোভোবাসীর আর কোন গত্যান্তর থাকল না।

আজম ভাসীকে প্রতিবিপ্লবীও বিচ্ছিন্নতাবাদী আখ্যা দিয়ে যুগোস্লাভ কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে বহিস্কার করা হলে কসোভোবাসী আবার বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ১৯৮৯ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী কসোভোর ট্রেপচা খনি শ্রমিকেরা খনি গহ্বরের অভ্যন্তরে অবস্থান ধর্মঘট শুরু করে। কসোভো পার্টির নেতৃত্ব থেকে মিলোসেভিচের দালালদের অপসারণ সহ তাদের অন্যান্য জাতিগত দাবি না মানা পর্যন্ত ১৩০০ খনি শ্রমিক তাদের খনি গুহায় প্রচণ্ড ঠান্ডা ও অনাহারে প্রাণ বিসর্জন দেবে বলে ঘোষণা করে। খনি গুহামুখে অপেক্ষারত খনি শ্রমিকদের অসহায় পরিবারগুলির মত পুরো কসোভোর জীবনযাত্রা হঠাৎ করে স্থবির হয়ে পড়ে। ছাত্র যুবকেরা প্রিষ্টিনায় অনির্দিষ্ট কালের জন্য হরতাল আহ্বান করে ট্রেপচা খনির পরিচালক বার বার সবিনয়ে রাষ্ট্রীয় কর্ণধারদেরকে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, খনির অভ্যন্তরে ২৪০০ কেজি বিস্ফোরক থাকায় যে কোন সময়ে একটি মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে যেত। যুগোস্লাভিয়ার তৎকালীন ফেডারেল প্রেসিডেন্ট, বসনিয়ার প্রতিনিধি রাইফ ডিসডারোভিচ ছাড়া অন্য কারো মাঝে এই করুন আকুতি কোন প্রতিক্রিয়ার উদ্রেগ করেনি। কিন্তু তিনি তখন এক অসহায় ব্যক্তিত্ব মাত্র। মিলোসেভিচ তখন বেলগ্রেডে বসে কসোভোয় জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে সেনা অভিযানের জন্য চাপ দিচ্ছেন, অপরদিকে যুক্ত প্রেসিডেন্সীর সার্বিয় প্রতিনিধি জেনারেল পিটার প্রাচানিন হুমকি দিচ্ছেন যে, প্রয়োজনবোধে ৫০,০০০ সার্ব ও মন্ট্রিনিগ্রায়ান স্বেচ্ছাসেবক কসোভো অভিযানের জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছেন। যুগোস্লাভ পলিটব্যুরোর এক জরুরি সভায় মিলোসেভিচ স্লোভেন পার্টি প্রধান কুচানকে পরিস্কার ভাষায় জানিয়ে দিলেন যে, কসোভো সংক্রান্ত শাসনতান্ত্রিক সংশোধনীর পরিকল্পনা তিনি কোন অবস্থাতেই বাদ দেবেন না, তাতে যুগোস্লাভিয়াটিকে থাকুক বা ভেঙ্গে পড়ুক। পরদিনই সারা সার্বিয়ায় প্রচার হয়ে যায় যে, খনি শ্রমিকদের ধর্মঘট অব্যাহত রাখতে গোপনে ক্রোয়াট এবং স্লোভেন বা খাদ্য সরবরাহ করে যাচ্ছে। মিলোসেভিচ ক্রমাগত যুগোস্লাভ প্রেসিডেন্টকে কসোভোতে সেনাবাহিনী মোতায়েনের জন্য চাপ দিতে থাকলেন।

এরই পাশাপাশি তিনি ধর্মঘট প্রত্যাহারের জন্য আজম ভাসীর উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন। কিন্তু ভাসী তাকে পরিস্কার জানিয়ে দেন, যে, খনি শ্রমিকেরা যা করছে তা নিতান্তই তাদের স্বতস্ফুর্ত প্রতিক্রিয়া, এখানে তার কিছুই করার নেই। অবশেষে বাধ্য হয়ে মিলোসেভিচ তার কসোভোর দালালদেরকে পদত্যাগের অনুমতি দিলে ধর্মঘটের অবসান হয়। পুরো এক সপ্তাহ ভূগর্ভে অবস্থানের পর ১৮০ জনকে হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়, বাকিরা তাদের অবস্থান ত্যাগ করে।

এর পরদিন স্লোভেনিয়ার রাজধানী লুবজানায় স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের উপস্থিতিতে স্লোভেন মানবাধিকার কমিটি কসোভো খনি শ্রমিকদের ধর্মঘটের সমর্থনে এক র‍্যালির আয়োজন করে। স্লোভেন পার্টি প্রধান কুচান সহ সমস্ত বক্তা কসোভোবাসীর বিরুদ্ধে সার্বিয় ষড়যন্ত্রের নিন্দা জানান। জনৈক যুব কমিউনিষ্ট নেতা কসোভোর আলবেনীয়দের বর্তমান অবস্থাকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে জার্মান ইহুদীদের সাথে তুলনা করেন। লুবজানা টেলিভিশন পুরো অনুষ্ঠানটি সম্প্রচার করে। সার্বিয় একাডেমি অব সায়েন্সেস এর আদর্শে অনুপ্রাণীত মিলোসেভিচের বংশবদ প্রচারবিশারদের নাটের গুরু, বেলগ্রেড টেলিভিশনের কার্যনির্বাহী প্রধান মিটোভিচ এই পর্যায়ে এক ভয়ঙ্কর চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি পুরো অনুষ্ঠানটি ধারণ করে সার্বো-ক্রোয়াট 'সার্ব টাইটেল'সহ বেলগ্রেড টেলিভিশন থেকে পুনঃপ্রচার শুরু করেন। কয়েক ঘন্টার মধ্যে বেলগ্রেড শহরের চেহারা সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। হাজার হাজার জনতা রাজপথে নেমে আসে এবং তাদের মিলিত জনস্রোতে ক্রমে পার্লামেন্ট ভবনকে ঘিরে ফেলে। পরিস্থিতি পুলিশের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। রাতারাতি বিক্ষোভকারীদের সংখ্যা প্রায় লক্ষাধিকে গিয়ে ঠেকে। জনগণ কসোভোর স্বায়ত্তশাসন বিলোপ সংক্রান্ত শাসনতান্ত্রিক সংশোধনীর পক্ষে স্লোগান দিতে থাকে। সাবেক কসোভো পার্টি প্রধান আজম ভাসীর মুন্ডু ও দাবি করা হয়। সেই সাথেই উঠতে থাকে মিলোসেভিচ জিন্দাবাদ ধ্বনি। মিলোসেভিচ তখন বেলগ্রেডের বাইরে ছিলেন। অবস্থাদৃষ্টে মনে হতে লাগল যে, তাকে ছাড়া বিক্ষোভরত জনগণকে শান্ত করে ঘরে ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। সার্বিয় এবং ফেডারেল যুগোস্লাভ সরকার সংকট নিরসনের উদ্দেশ্যে এক জরুরী সভায়

মিলিত হলেন। তাৎক্ষনিক করণীয় সম্পর্কে কারো কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। দ্রুত ধাবমান ঘটনা প্রবাহে সবাই ছিলেন প্রায় কিংকর্তব্যবিমূঢ়। যুগোস্লাভ নেতারা জানতেন না, এটি 'সার্বিয়ান একাডেমি অব সায়েন্সেস'-এর বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক 'ক্যাম্পেইন'। এমনই এক পরিস্থিতিতে সভাকক্ষে নাটকীয়ভাবে প্রবেশ করেন নায়করাজ মিলোসেভিচ। এসেই তিনি কসোভোতে জরুরী অবস্থা ঘোষণার দাবি জানান। কিন্তু স্লোভেন পার্টি প্রধান কুচান তার তীব্র বিরোধীতা করেন। সভাকক্ষে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছিল না। ওদিকে লক্ষাধিক বিক্ষুব্ধ জনতা ফেডারেল পার্লামেন্ট ভবন ঘিরে রয়েছে। তারা ঘরে ফিরতে নারাজ। মিলোসেভিচ ভিতরে বসে তামাশা দেখছেন।

অবশেষে সিদ্ধান্ত হল, ফেডারেল যুগোস্লাভ প্রেসিডেন্সীর তৎকালীন প্রধান নির্বাহী বসনিয়ার রাইফ ডিসডারোভিচ জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন। সার্বিয়ার প্রতিনিধি জেনারেল গ্রাচানিন তাকে ৭৪ সালের সংবিধানে রক্ষিত কসোভোর স্বায়ত্তশাসন বাতিলের প্রতিশ্রুতি প্রদানের পরামর্শ দিলেন। কম্পিত যুগোস্লাভ প্রেসিডেন্ট জনতার সামনে দাড়ালেন। কিন্তু জনতা তার কথা শুনতে নারাজ তারা চায় মিলোসেভিচকে। ডিসডারোভিচ কথা বলতে শুরু করলে নিকটে দাঁড়িয়ে মিলোসেভিচের এক তরুন স্যাঙ্গাৎ এত উচ্চ স্বরে তাকে তার বক্তব্য বিষয় নির্দেশ করছিল যে, পুরো ঘটনাটি একটি প্রহসনে পরিণত হল। জনতা আবার মিলোসেভিচ এর নাম ধরে চিৎকার শুরু করল। ব্যর্থ অভিনেতার মত মঞ্চ থেকে নেমে এলেন ফেডারেল যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট। তার পদমর্যাদা যাই হোক না কেন, সার্ব জনতা তাকে গ্রহণ করতে নারাজ। এই ঘটনা থেকেই যুগোস্লাভিয়ার তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির অবস্থা অনুমান করা যায়। কুচান যথার্থই যাকে 'সার্বোস্লাভিয়া' আখ্যা দিয়েছিলেন। জন সমাবেশের চব্বিশ ঘন্টা পার হয়ে যাবার পরে অবশেষে নায়করাজ মিলোসেভিচ মঞ্চে আরোহণ করলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, সার্ব জনতা ও তাদের নেতৃত্বকে কোন শক্তিই দাবিয়ে রাখতে পারবে না, তারা ১৯৭৪ সালের সংবিধান সংশোধন করেই ছাড়বেন। আলবেনীয় প্রতিবিপ্লবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদীদেরকে সাজা পেতেই হবে। সন্তুষ্ট চিত্তে জনগণ ঘরে ফিরে গেল। ২৪ ঘন্টার

মধ্যে আজম ভাসী গ্রেপ্তার হলেন। এর একমাসের মধ্যে সার্বিয় গণ পরিষদ কর্তৃক কসোভোর স্বায়ত্তশাসন সংক্রান্ত ১৯৭৪ এর সংবিধান সংশোধিত হল। ১৯৯৮ সালের ২৮শে মার্চ সমগ্র সার্বিয়া আনন্দ-উল্লাসে মেতে উঠল। দিনটিকে সরকারি ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করা হল। ওদিকে দুই দিন ব্যাপী হরতালও গণবিক্ষোভের মাঝে ২২জন কসোভোবাসী পুলিশের গুলিতে নিহত হল। বেলগ্রেড মিডিয়াগুলি এই মর্মান্তিক ঘটনার জন্য সামান্য দুঃখ প্রকাশের সৌজন্যটুকুও বোধ করল না। প্রকৃতপক্ষে তখন থেকেই কসোভো সার্বিয়ার সামরিক দখলদারিত্বের অধীনে চলে গেল। এ সবই চলতে লাগল যুগোস্লাভিয়ার আঞ্চলিক অখন্ডতা রক্ষার নামে। দেশটি যে আর যুগোস্লাভিয়া নেই, সার্বোস্লাভিয়া হয়ে গেছে এ সত্য দেশটির প্রতিটি প্রজাতন্ত্রের প্রতিটি নাগরিকই জানতেন, শুধু জানতেন না পাশ্চাত্য পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের মানবাধিকারবাদী গুরু-ঠাকুরেরা।

২২ শে জুন কসোভো যুদ্ধের ছয়শতম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ছয়শত বৎসর পূর্বে এই দিনে সার্বিয়ার প্রিন্স ল্যাজার অটোমান তুর্কীদের দ্বারা পরাজিত ও নিহত হয়েছিলেন। সার্বিয় লোকগাথা অনুযায়ী ঐ সময়ে আক্রমণকারী তুর্কী সেনাপতি প্রিন্স ল্যাজারকে পুরস্কারের বিনিময়ে আত্মসমর্পনের আহ্বান জানিয়েছিলেন। ল্যাজার যখন তার কর্তব্যকর্ম নিয়ে চিন্তামগ্ন ছিলেন তখন স্বয়ং মেরীমাতা তার সামনে নেমে এসে তাকে বিধর্মী দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে আমরণ যুদ্ধ করে স্বর্গবাসী হবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সে নির্দেশ ল্যাজার অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। যুদ্ধে নিহত ল্যাজারর দেহাবশেষ পড়ে রইল গ্রাচনিকার অর্থোডক্স মনাষ্টেরীতে, আর ল্যাজার মেরীমাতার নির্দেশে স্বর্গবাসী হলেন। কসোভো তুর্কী আধিপত্যে চলে গেল কয়েক শতকের জন্য। ১৯১২ সালে সার্বিয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কসোভো পুনর্দখল করতে সক্ষম হলেও ক্রোয়াট ও স্লোভেন মিশ্রিত রক্তের জাতক জোসেফ ব্রোজ টিটো সার্বিয়াকে তার বিজয়ের ফসল ভোগ করতে দেননি। এবার ১৯৯৮ সালের ২৮শে মার্চ মিলোসেভিচ ছয়শত বৎসর পরে তা পুনরুদ্ধার করে সার্বিয়ার হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনলেন। তার তিন মাস পর কসোভো যুদ্ধের ছয়শত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে গোটা বিশ্বে সার্ব জাতির বিজয় উল্লাসের

দিন। সার্ব জাতির পুনরুত্থান ২৮ শে জুন ১৯৯৮, সূর্যোদয়ের পূর্ব থেকে খোদ সার্বিয়াসহ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ সার্ব জমা হতে লাগল কসোভোর রাজধানী প্রিষ্টিনা শহরের অদূরে গাজিমেস্তানস্থ ঐতিহাসিক ব্লাকবার্ড যুদ্ধক্ষেত্রে আজ শুধু সার্ব জাতীয়তাবাদ নয় খৃষ্টীয় অর্থোডক্সদেরও যেন পুনরুত্থান দিবস। পুরো মাস ধরে পরিচালিত প্রস্তুতি পর্বের আজ চূড়ান্ত দিন। প্রিষ্টিনা এখন নতুন সাজে সজ্জিত, সমস্ত রাজপথ জুড়ে সার্ব রাজবংশ ও অর্থোডক্স চার্চের প্রতীক দুই মাথা বিশিষ্ট শ্বেত ঈগল শোভিত টেকনিক রন সাজে সজ্জিত হয়ে লক্ষ লক্ষ সার্ব নর-নারী বিজয় মেলা বসিয়েছে, মাইকে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে সার্ব ফোক সঙ্গীত, আবাল বৃদ্ধ বনিতা সবাই এই বিজয় মেলায় শরিক হয়েছেন। পুরো শহর যেন পরিত্যক্ত। রাস্তায় কোন যানবাহন নেই। কসোভোর প্রকৃত বাসিন্দা, শতকরা ৯০ ভাগ আলবেনীয় জাতিভূক্ত মুসলমান আজ গৃহবন্দী।

তাদের বুকের উপর দাঁড়িয়ে চলেছে সার্ব জাতীয়তাবাদের বিজয়োল্লাস। ব্ল্যাকবার্ড রণক্ষেত্রে ঐতিহ্যবাহী কালো আলখেল্লাধারী অর্থোডক্স ধর্ম যাজকদের সদম্ভ ভাবগম্ভীর পদচারনা ঐতিহাসিক রণক্ষেত্রটিকে আজ সত্যিই যেন এক স্বর্গীয় দ্যুতিতে ভরিয়ে দিয়েছে। পুরো এলাকা জুড়ে মেলা বসেছে। মেলার বিভিন্ন ষ্টলে পাশাপাশি সাজানো রয়েছে যিশুখৃষ্ট, প্রিন্স ল্যাজার আর স্লোভেদান মিলোসেভিচ এর প্রমান সাইজের পোষ্টার। এরা তিন জনেই যেন আজ সমান মর্যাদার অধিকারী। গ্রাচানিকার অর্থোডক্স মনাষ্টেরী থেকে সর্বসাধারনের দর্শনের জন্য উপস্থিত করা হয়েছে প্রিন্স ল্যাজারের ছয়শত বৎসরের পুরাতন কংকাল। সারিবদ্ধভাবে সার্ব জনতা তীর্থদর্শনের অনুভূতি নিয়ে দেখে যাচ্ছে শতাব্দী প্রাচীন কংকাল। এখান থেকে আজ শুরু হবে এক অভূতপূর্ব শোভাযাত্রা। এই কংকাল প্রদর্শিত হবে গোটা সার্বিয়ায় তো বটেই এমনটিকে অন্যান্য প্রজাতন্ত্রের যে সমস্ত এলাকায় সার্বরা সংখ্যাগুরু সেখানেও। পরবর্তীকালে দেখা গেছে যে, অন্যান্যা প্রজাতন্ত্রের যে সমস্ত এলাকায় এই কংকাল প্রদর্শিত হয়েছে সেই সব এলাকাতেই পরবর্তীকালে সার্ব বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছে। উগ্র জাতীয়তাবাদের সাথে ধর্মীয় উন্মাদনা যোগ করে গোটা সার্ব জাতির রক্তে আগুন ধরিয়ে দেবার এক মহা আয়োজন। এমনই এক পরিবেশে

হেলিকপ্টার যোগে মিলোসেভিচের বেশে নেমে এলেন যেন স্বয়ং প্রিন্স ল্যাজার। কালো আলখেল্লাধারী অর্থোডক্স ধর্ম যাজকদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে লক্ষ লক্ষ সার্ব জনতার সামনে তিনি ঘোষণা করলেন, ছয়শত বৎসর পরে আমরা একটি যুদ্ধের সম্মুখীন হয়েছি, যদিও তা সশস্ত্র যুদ্ধ নয়, তবুও সে সম্ভাবনাকে এখন আর বাদ দেওয়া উচিৎ নয়। যুগোস্লাভিয়াতথা গোটা বিশ্বের সামনে তিনি প্রকাশ্যে গৃহযুদ্ধের হুমকি দিয়ে গেলেন। পশ্চিমের মানবাধিকারবাদীরা তখনো ঘুমে অচেতন, আর যুগোস্লাভিয়ার আঞ্চলিক অখন্ডতা রক্ষার স্বপ্নে বিভোর।

আট সদস্য বিশিষ্ট যুগোস্লাভ প্রেসিডেন্সীর মধ্যে চারটিই যথা, সার্বিয়া, ভজভোদিনা, কসোভো এবং মন্টিনিগ্রোর সদস্য পদ তখন মিলোসেভিচের পকেটস্থ। এখন শুধুমাত্র একটি প্রজাতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেই তিনি ফেডারেল যুগোস্লাভিয়ার সংবিধান নতুন করে রচনা করে সার্ব আধিপত্যবাদকে একটি শাসনতান্ত্রিক রূপ দিতে সক্ষম। অর্থ্যাৎ তার প্রথম কৌশল, যুগোস্লাভ ফেডারেল রাষ্ট্র কাঠামোকে ব্যবহার করে যুগোস্লাভিয়াকে সার্বোস্লাভিয়ায় পরিণত করার পরিকল্পনা এবার সফল হতে চলেছে। যুগোস্লাভিয়ার সংবিধানকে সংশোধন করে এক প্রজাতন্ত্র এক ভোট নীতিকে বাতিল করে, এক ব্যক্তি এক ভোট প্রথা চালু করতে পারলে সংখ্যাগরিষ্ঠতার শক্তিকে সার্বিয়া সমগ্র যুগোস্লাভ ফেডারেশনকে নিজ প্রাধান্যের অধীনে নিয়ে আসতে পারত। দুর্বল প্রজাতন্ত্র মেসিডোনিয়া যে তখন তার পরবর্তী শিকার তা গোটা যুগোস্লাভিয়ার প্রতিটি প্রজাতন্ত্রের নেতৃত্বই বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু তার পাকা ধানে মই দিয়ে বসল স্লোভেনিয়া।

১৯৮৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে স্লোভেনিয়ার পার্টি নেতৃবৃন্দ নিজস্ব প্রজাতান্ত্রিক পরিষদে স্লোভেন সংবিধানের কয়েকটি খসড়া সংশোধনী পেশ করেন। দূরদৃষ্টি সম্পন্ন পার্টি প্রধান কুচার মিলোসেভিচের মতলব আগেই বুঝে গিয়েছিলেন। প্রস্তাবিত সংশোধনীর মাধ্যমে স্লোভেন প্রজাতন্ত্র নিজস্ব আইনের ক্ষেত্রে প্রজাতন্ত্র গণপরিষদের সার্বভৌমত্বের প্রস্তাব করে। এই সমস্ত প্রস্তাবাবলী দ্বারা যদিও পরিপূর্ণ স্বাধীন সার্বভৌমত্বের দাবি করা হয়নি, তবুও প্রজাতন্ত্রটির ক্ষেত্রে যুগোস্লাভ ফেডারেল আইনের উপরে স্লোভেন প্রজাতন্ত্র প্রণীত নিজস্ব আইনের অগ্রগণ্যতাকে

বিধিবদ্ধ করার ব্যবস্থা করা হয়। নিজের পরিকল্পিত শাসনতান্ত্রিক অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা নস্যাৎ হতে চলেছে দেখে মিলোসেভিচ ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন।

সার্বিয়া, প্রজাতন্ত্র সরকার প্রস্তাবিত স্লোভেন শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের উপর আলোচনার প্রস্তাব করে। প্রত্যুত্তরে স্লোভেনিয়া স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয় যে, সার্বিয়া ইতোমধ্যেই কসোভোবাসীর প্রাণের বিনিময়ে নিজস্ব সংবিধান সংশোধন করে নিয়েছে। সুতরাং, প্রস্তাবিত স্লোভেন শাসনতান্ত্রিক সংশোধনীর ক্ষেত্রে সার্বিয়ার কোন ভূমিকা থাকতে পারে না। যা কিছু যুগোস্লাভিয়ার মধ্যে ঘটেছে স্বয়ং সার্বিয়াই তার উদ্যোক্তা। নিজ সরকারের সম্মতি গ্রহণ করেননি, এমনকি প্রয়োজনে সার্বিয়ার প্রজাতান্ত্রিক স্বাতন্ত্রের অজুহাতে যুগোস্লাভ লীগ অব কমিউনিষ্ট এর কার্যপ্রণালতিতেও বাধা প্রদান করে। সুতরাং, স্লোভেনিয়া তার নিজস্ব শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের ক্ষেত্রে সার্বিয়ার সাথে আলোচনা করতে বাধ্য হয়।

অবস্থা সুবিধের নয় দেখে আট সদস্য বিশিষ্ট ঘুর্নেয়মান যুগোস্লাভ ফেডারেল প্রেসিডেন্সীর সার্বিয় প্রতিনিধি যোভিচ স্লোভেনিয়ার প্রস্তাবিত শাসনতান্ত্রিক সংশোধনীর উপর আলোচনার জন্য যুক্ত প্রেসিডেন্সীর জরুরী বৈঠকের ব্যবস্থা করেন। প্রেসিডেন্সীর সভায় স্লোভেনিয়ার শাসনতান্ত্রিক পদক্ষেপকে বেআইনি ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রাক্কালে ঘুর্নেয়মান প্রেসিডেন্সীর তৎকালীন প্রধান নির্বাহী স্লোভেনিয়ার যানেজ দ্রনোভশেক হুশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন যে, এরূপ কাঠখোট্টা ঘোষণার ফল হিতে বিপরীত হতে পারে। ফলে, কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই প্রেসিডেন্সীর সভা শেষ হয়। অবশেষে যোভিচ পুনরায় আলোচনার জন্য স্লোভেন নেতৃবৃন্দকে বেলগ্রেডে আমন্ত্রণ জানান। প্রস্তাবিত সংশোধনীর দুইটি প্রস্তাব, তথা যুগোস্লাভ ফেডারেল সশস্ত্র বাহিনী, যে.এন.এ এর স্লোভেনিয়ায় প্রবেশ করা ও কর্মতৎপরতা চালাবার জন্য স্লোভেন সরকারের পূর্ব অনুমতির শর্ত এবং স্লোভেন প্রজাতন্ত্র সরকারের নিজ দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণার ক্ষমতা, যুগোস্লাভিয়ার ১৯৭৪ সালের সংবিধানের পরিপন্থী বলে যোভিচ দাবি করেন। প্রত্যুত্তরে স্লোভেন পার্টি প্রধান কুচান পাল্টা অভিযোগ করেন যে, স্লোভেনিয়ার উপর চাপ সৃষ্টি করে

সার্বিয়াই বরং ১৯৭৪ সালের সংবিধানকে লংঘন করছে। অবশেষে বিষয়টি যুগোস্লাভ ফেডারেল আদালতের সিদ্ধান্তের জন্য পাঠানো হয়। সংশোধনী প্রস্তাবগুলি তখনো স্লোভেন সংসদে উত্থাপন করা হয়নি। বিধায় আদালত কোন আনুমানিক বিষয় এর উপর রায় প্রদান করতে অপরগতা প্রকাশ করে। আদালতে ব্যর্থ হয়ে যোভিচ ও মিলোসেভিচ পরিস্থিতির দায়িত্ব যুগোস্লাভ প্রতিরক্ষামন্ত্রী সার্ব জেনারেল কাদিযোভিচ এর হাতে ন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যিনি ছিলেন তাদের পুরনো গাঁট ছড়ার এক অন্যতম সদস্য। মিলোসেভিচের একান্ত বাধ্যগত হওয়া সত্ত্বেও জেনারেল কাদিযোভিচ সামরিক হস্তক্ষেপের ঝুঁকি নিতে ইতস্তত করতে লাগলেন। পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে মিলোসেভিচ গং এবার ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করলেন। স্লোভেন সংসদের প্রস্তাবিত সংবিধান সংশোধনী অধিবেশনের ঠিক আগের দিন হঠাৎ করে স্লোভেন কমিউনিষ্ট পার্টির নেতাদেরকে বেলগ্রেডস্থ যুগোস্লাভ কেন্দ্রীয় কমিটি সভার জন্য আহ্বান করা হল।

পরিস্থিতি জটিল বুঝতে পেরে কুচান স্লোভেন পার্টির এক জরুরী বৈঠকের আয়োজন করেন। সভা সর্বসম্মতিক্রমে যে কোন পরিস্থিতিতে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের কার্যক্রম চালিয়ে যাবার পক্ষে রায় প্রদান করে। জেনারেল কাদিযোভিচের সম্ভাব্য নাশকতামূলক পদক্ষেপের আশংকায় পরদিন স্লোভেন নেতৃবৃন্দ ভিন্ন ভিন্ন ফ্লাইটে বেলগ্রেড পৌঁছান। যাত্রার প্রাক্কালে স্থির হয় যে, পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি হলে তারা স্থলপথে বুলগেরীয় সীমান্ত দিয়ে ঘুরে এসে লুবজানায় পৌঁছবেন। বেলগ্রেড তাদের জন্য সুসংবাদ এবং দুঃসংবাদ দুটোই অপেক্ষা করছিল। যুগোস্লাভ কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিশেষ অধিবেশনে ক্রোয়েশিয়ার সমর্থন লাভ করার পরও প্রস্তাবিত শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের উপর গৃহিত ভোটে স্লোভেনিয়া ৫৭ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হয়। কিন্তু ভোটে পরাজিত হলেও এটা ছিল স্লোভেন পার্টির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত বিজয় কারণ এবার তারা প্রকাশ্যে যুগোস্লাভিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রজাতন্ত্র ক্রোয়েশিয়ার সমর্থন লাভ করেছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যুগোস্লাভ রাজনীতির কঠিন বাস্তবতার ভাষাকে স্লোভেন নেতারা ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন এবং ফিরতি পথেই তারা

জাতীয় শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের প্রশ্নে বেলগ্রেডকে অস্বীকার করবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন। সেই অনুসারে ২৭শে সেপ্টেম্বর স্লোভেন সংসদ শাসনতান্ত্রিক সংশোধনী সহ নিজেকে অভ্যন্তরীন বিষয়ে সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র বলে ঘোষণা করে।

স্লোভেন নেতৃবৃন্দ দুরদর্শিতার কাছে নাস্তানাবাদ হয়ে মিলোসেভিচ চরম দুঃসাহস দেখিয়ে লুবজানায় সদ্য ভাষণের সভা নামে একটি র‍্যালি অনুষ্ঠান করবেন বলে ঘোষণা করেন। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে সামরিক হস্তক্ষেপের ক্ষেত্র প্রস্তুত করবার বাহানা বলে ঘোষণা করে স্লোভেন সরকার এই র‍্যালিকেই বেআইনি ঘোষণা করলে বাধ্য হয় মিলোসেভিচ তার পরিকল্পনা ত্যাগ করেন। বুদ্ধিমত্তার খেলায় মার খেয়ে মিলোসেভিচ সার্বিয়ার সমস্ত বানিজ্যিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠানকে স্লোভেনিয়ার সাথে সমস্ত প্রকার লেন-দেন বন্ধ করে দেবার নির্দেশ দেন। সমস্ত প্রকার স্লোভেন পণ্য বয়কট করা হল। এরই মাঝে সার্বিয় পার্লামেন্ট মিলোসেভিচকে দেশের প্রেসিডেন্ট বলে ঘোষণা করে।

১৯৯০ সালের ২৩শে জানুয়ারি যুগোস্লাভ কমিউনিষ্ট পার্টির চতুর্দশ বিশেষ কংগ্রেসের আয়োজন করা হয়। কংগ্রেস অধিবেশনে প্রকাশ্যেই একদিকে সার্বিয়া অপরদিকে স্লোভেনিয়া ও ক্রোয়েশিয়া এই দুইভাগে ভাগ হয়ে যাওয়ায় পারস্পরিক কাদা ছোড়াছুড়ি ছাড়া আর কিছুই হল না। যুগোস্লাভ কমিউনিষ্ট পার্টি অবশেষে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়ছে দেখে বসনীয় পার্টি প্রধান নিয়াজ ডুরাকোভিচ প্রেসিডেন্ট মিলোসেভিচও কুচানের সামনে একটি সমঝোতায় পৌছানোর জন্য করজোড়ে প্রার্থনা করেন। কিন্তু সার্ব প্রতিনিধিদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের সামনে স্লোভেন প্রতিনিধিদের পক্ষে বেশিক্ষণ সম্মেলন কক্ষে টিকে থাকা সম্ভব ছিল না। অল্প কিছুক্ষণ পরই তারা একজোট হয়ে সভাকক্ষ ত্যাগ করে। স্লোভেনদের পর ক্রোয়েশীয় প্রতিনিধিবৃন্দও সভাকক্ষ ত্যাগ করে যাবার সাথে সাথেই যুগোস্লাভ কমিউনিষ্ট পার্টির মৃত্যু ঘন্টা বাজতে শুরু করে। এটাই ছিল যুগোস্লাভ কমিউনিষ্ট পার্টির সর্বশেষ কংগ্রেস। ভেঙ্গে গেল যুগোস্লাভ কমিউনিষ্ট পার্টি।

এর দুই সপ্তাহ পরে স্লোভেনিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টি তার নাম পরিবর্তন করে 'পার্টি অব ডেমোক্রেটিক রিনিউয়্যাল' রাখে। ১৯৯০ সালের বসন্তকালে স্লোভেনিয়া ও ক্রোয়েশিয়ায় পশ্চিমা ধাচে বহুদলীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। স্লোভেনিয়ায় একটি উদারনৈতিক জাতীয়তাবাদী কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রোয়েশিয়ায় যুগোস্লাভ সামরিক বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল ফ্রাঞ্জো তুজমানের নেতৃত্বে ক্রোয়েশিয়ান ডেমোক্রেটিক ইউনিয়ন তথা এইচ.ডি.জেড সরকার গঠিত হয়।

এর পরে আর ফেডারেল যুগোস্লাভিয়ার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা সম্ভব ছিল না। যা কিছু টিকে ছিল তা সিলমোহর মাত্র। এর কিছুদিন পর মিলোসেভিচ তার পার্টির নাম বদলে 'সার্বিয়ান সোস্যালিষ্ট পার্টি' রাখেন এবং বহুদলীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন।

এবার তিনি কৌশল বদলাতে বাধ্য হলেন, কারণ কমিউনিষ্ট পার্টি ভেঙ্গে যাবার ফলে তার পক্ষে আর কমিউনিষ্ট যুগোস্লাভিয়ার ফেডারেল শক্তি কাঠামোকে ব্যবহার করে উদ্দেশ্য হাসিল করা সম্ভব ছিল না। এবার তিনি তার দ্বিতীয় কৌশল ব্যবহার করার প্রস্তুতি গ্রহন করতে শুরু করলেন। যা ছিল অতি ভয়ঙ্কর। ক্রোয়েশিয়া ও স্লোভেনিয়ার নেতৃবৃন্দ এর পরও যুগোস্লাভিয়াকে অখন্ড রেখে প্রতিটি প্রজাতন্ত্রের সম মর্যাদার ভিত্তিতে একটি কনফেডারেশন গঠনের প্রয়াসে লিপ্ত থাকেন। কিন্তু মিলোসেভিচ তখন বৃহত্তর সার্বিয়া গঠনে তার দ্বিতীয় কৌশল প্রয়োগের অপেক্ষায়। ১৯৯১ সালের প্রথম দিকে ক্রুদ্ধ মিলোসেভিচ ঘোষণা করেন যে, যদি কোন প্রজাতন্ত্র যুগোস্লাভিয়ার ফেডারেল রাষ্ট্র কাঠামোকে একটি কনফেডারেশনে পরিণত করার চেষ্টা করে তবে তিনি সমগ্র বসনিয়া ও ক্রোয়েশিয়াকে সরাসরি অবিচ্ছেদ্য অংগ বলে ঘোষণা করবেন এবং প্রয়োজনবোধে জোর পূর্বক সে দাবি প্রতিষ্ঠিত করবেন। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, যুগোস্লাভ প্রতিরক্ষামন্ত্রী জেনারেল কাদিযোভিচের জন্য তার একটি ইশারই যথেষ্ট ছিল। স্নায়ু যুদ্ধের দীর্ঘ সময়কাল ধরে সংগ্রহকৃত বিশাল অস্ত্র সম্ভারে সজ্জিত যুগোস্লাভ ফেডারেল সশস্ত্র

বাহিনী যে.এন, যা যে কোন পাশ্চাত্য বা রুশ আগ্রাসন প্রতিরোধের ক্ষমতা রাখত, তার পক্ষে এ কাজটি নিতান্তই ছেলের মোয়া কেড়ে নেবার মতই সহজ সাধ্য ছিল।

এবার এলো মিলোসেভিচের দ্বিতীয় কৌশল, তথা অন্যান্য প্রজাতন্ত্রগুলির সার্ব সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলিতে বিদ্রোহ ঘটিয়ে, শান্তি রক্ষার ছদ্মবরনে সার্ব অধ্যূষিত যুগোস্লাভ সেনাবাহিনীর দ্বারা এলাকাগুলি দখল করে নিয়ে, সুযোগ বুঝে সার্বিয়ার অংগীভূত করার কৌশল প্রয়োগের পালা। এক্ষেত্রে সার্বিয়ার মূল ভূখন্ড সংলগ্ন অন্যান্য প্রজাতন্ত্রের আওতাধীন এলাকাগুলিই ছিল সহজ টার্গেট। যেখানে টার্গেট এলাকাগুলি সার্বিয়ার প্রজাতান্ত্রিক সীমান্ত থেকে দূরে অর্থ্যাৎ অন্যান্য প্রজাতন্ত্রের অভ্যন্তরভাবে অবস্থিত সেখানে প্রয়োজনবোধে বিদ্রোহী এলাকা ও সার্বিয়ার সীমান্তের মধ্যবর্তী এলাকাগুলি থেকে সন্ত্রাসী কার্যকলাপের মাধ্যমে অ-সার্ব জনগোষ্ঠীকে বিতাড়িত করে অথবা গণহত্যার মাধ্যমে এলাকাগুলি পরিস্কার করে কমপক্ষে সার্বিয়ার মূল ভূখন্ডের সঙ্গে একটি করিডোর স্থাপন করা। উল্লেখ্য যে, গোটা সার্ব জাতির শতকরা চল্লিশ ভাগই বাস করত সার্বিয়ার বাইরে অন্যান্য প্রজাতন্ত্রে। এই চল্লিশ ভাগকে নিয়েই শুরু হল মিলোসেভিচের পরবর্তী খেলা।

সার্বিয় বেতার-টেলিভিশনসহ অন্যান্য প্রচার মাধ্যমগুলিতে কার্যরত মিলোসেভিচের বশংবদ প্রচার বিশারদগণ গোয়েবলসীয় কৌশলে যুগোস্লাভিয়ার অন্যান্য প্রজাতন্ত্রে বসবাসরত সার্ব জনগোষ্ঠীর মাঝে আতংক ছড়াতে শুরু করে। একই সাথে যুগোস্লাভ ফেডারেল সেনাবাহিনী যে, এন, এ-এর কমান্ডারগণ স্থানীয় সার্বদের মাঝে গোপনে অস্ত্র সরবরাহ শুরু করে। প্রজাতন্ত্রগুলিতে বহুদলীয় রাজনীতি প্রচলিত হবার সুবাদে প্রতিটি প্রজাতন্ত্রেই প্রতিষ্ঠিত হল একটি করে সার্ব জাতীয়তাবাদী পার্টি, মিলোসেভিচের গোপন নির্দেশ ছাড়া যাদের নিজস্ব কোন মেনোফেস্টো ছিল না।

মিলোসেভিচের প্রকাশ্য প্ররোচনামূলক কার্যকলাপের প্রেক্ষিতে স্লোভেনিয়ার মত একটি সমৃদ্ধশালী শান্ত প্রজাতন্ত্রের নেতৃত্ব যদি নিজ অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে নিজস্ব প্রজাতন্ত্রিক সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করতে পারে তবে বিগত ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে ক্রোয়েশিয়ার ভূমিকা হওয়া উচিৎ ছিল আরও ত্বরিত। কিন্তু তুলনামূলকভাবে ক্রোয়েশীয় প্রতিক্রিয়া এসেছে আরও পরে বরং বলতে গেলে অনেকটা স্লোভেনিয়ার প্রতিক্রিয়ার অনুসৃতিতে। তবে ঐতিহাসিক কারণেই সার্বিয়ার প্ররোচনার ক্রোয়াট জাতিগত প্রত্যুত্তরটি ছিল অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত ও গভীরতর। গোটা ক্রোয়াট জাতি যুগোস্লাভ ফেডারেল রাষ্ট্র কাঠামোর মাঝে প্রতিষ্ঠিত সার্ব আধিপত্যবাদের দ্বারা বরাবরই অবনত ছিল। ১৯৭১ সালে টিটো কর্তৃত ক্রোয়াটদের জাতীয় আন্দোলন 'ম্যাসপক' অবদমিত হবার পর থেকেই তারা নিজেদের জাতীয় চেতনার মাঝে একটি নীরব বিক্ষোভ জমা করে রেখেছিল। শুধুমাত্র কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র কাঠামোর দাপটের কারণেই এই বিক্ষোভটি প্রকাশ্য রূপলাভ করেনি। মিলোসেভিচ এই পুঞ্জীভূত বারুদে অগ্নি সংযোগ করলেন।

আড্রিয়াটিক উপকূলস্থ ক্রোয়েশিয়ার নীন এলাকা হল মিলোসেভিচের দ্বিতীয় কৌশলের প্রথম শিকার। পঞ্চাদশ শতকের অটোমান আক্রমণের সময় থেকেই আড্রিয়াটিক উপকূলবর্তী এলাকা অটোমান বনাম অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় বাহিনীর শক্তিদ্বন্দ্বের লীলাভূমি ছিল। সে কারণেই অস্ট্রো-হাঙ্গেরীর রাজ দরবার এলাকাটির নামকরণ করেছিলেন 'ভজনা ক্রজিনা' অর্থ্যাৎ সামরিক প্রান্তসীমা। ঐ সময় থেকেই অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় রাজ দরবার এই এলাকাটি অটোমান অধিকৃত এলাকা থেকে পালিয়ে আসা যোদ্ধা জাতি অর্থোডক্স ভ্লাচদেরকে বিশেষাধিকারের ভিত্তিতে বন্দোবস্ত দিতে থাকেন। কর সংক্রান্ত অন্যান্য সুবিধা ছাড়াও ভ্লাচদেরকে অর্থোডক্স ধর্ম পালনের পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়। যদিও অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় রাজ দরবারের রাষ্ট্রধর্ম ছিল তখন রোমান ক্যাথলিকবাদ। বর্তমান যুগে এসে এটি একটি অতি সাধারণ ঘটনা মনে হলেও তৎকালীন ইউরোপের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এটি ছিল একটি অনন্যসাধারণ বিশেষাধিকার। যার বিনিময়ে যোদ্ধা ভ্লাচ জাতি অগ্রসরমান অটোমানদের বিরুদ্ধে একটি স্থানীয়

প্রতিরোধ ব্যূহ রচনা করবার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। কালক্রমে এই ভ্লাচেরাই তাদের অর্থোডক্স ধর্মের কারণে নিজেদেরকে সার্ব বলে পরিচয় দিতে শুরু করে। প্রকারান্তে ক্রাজিনা এলাকার সার্ব সংখ্যাগুরু ক্যাথলিক অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় রাজ দরবারেরই অনুদান। নীন হল স্থানভেদে বিশ থেকে ষাট মাইল চওড়া এবং প্রায় এক হাজার মাইল লম্বা ক্রাজিনা সীমান্তের একটি এলাকা। ক্রাজিনার দক্ষিন-পূর্বে বসনিয়া আর দক্ষিণ-পশ্চিমে আড্রিয়াটিক সাগর। ১৯৯০ সালে অনুষ্ঠিত ক্রোয়েশিয়ার বহুদলীয় নির্বাচনের সময় এই এলাকার সার্ব নেতৃবৃন্দ সার্বিয়ান ডেমোক্রেটিক পার্টি নামে একটি দল গঠন করে। উগ্র সার্ব জাতীয়তাবাদের জনক ডরবিকা চসিচ এবং মিলোসোভিচের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধায়নে এ পার্টিটি গড়ে উঠে। শুরু থেকেই এই দলটি ক্রোয়াট জাতীয়তাবাদের পুনর্জাগরনের বিরুদ্ধে স্থানীয় সার্বদেরকে উত্তেজিত করার কাজে লিপ্ত হয়। এদের মূল মন্ত্রই ছিল ক্রোয়াট উষ্টাসা সরকারের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন এর বিরুদ্ধে স্থানীয় সার্বদের জাতীয় স্বাতন্ত্রকে রক্ষা করা। বেলগ্রেডের ইলেকট্রনিক মিডিয়া ও স্থানীয় পার্টির শত প্ররোচনা মূলক প্রচারণা সত্ত্বেও ক্রোয়েশীয় সার্ব জনগণ ক্রোয়াট কমিউনিষ্ট নেতা ইভিকা রাচান এর নেতৃত্বাধীন রূপান্তরিত কমিউনিষ্ট পার্টি 'পার্টি অব ডেমোক্রেটিক ডেঞ্জ'-এর পক্ষেই ভোট দেয়। সার্বিয়ান ডেমোক্রেটিক পার্টি নীন এলাকার পাশ্ববর্তী অঞ্চল থেকে ক্রোয়েশীয় আইন সভায় মাত্র পাঁচজন সদস্যকে নির্বাচিত করে পাঠাতে সক্ষম হয়।

১৯৯০ সালের নির্বাচনে জয়লাভের পর ক্রোয়েশিয়ান ডেমোক্রেটিক ইউনিয়ন তথা এইচ.ডি.জিড নেতা সাবেক পার্টিজান যোদ্ধা ও যে.এন.এ জেনারেল ফ্রাঞ্জো তুজমান সরকার গঠন করেন। ক্ষমতারোহনের পরপরই তুজমান সার্বিয়ান ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতা রাশকোভিচ কে স্থানীয় সার্বদের নেতা হিসেবে তার কোয়ালিশন সরকারে যোগাদানের আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু রাশকোভিচ এই প্রস্তাব প্রত্যাখান করে ক্রোয়েশিয়ার অভ্যন্তরে সার্ব অটোনমি দাবি করে বসেন। এ প্রসঙ্গে রাশকোভিচ এর দাবিটি ছিল অস্পষ্ট, অনেকটা সাংস্কৃতিক স্বায়ত্তশাসন-এর সমতূল্য, কারণ তিনি সার্ব স্বায়ত্তশাসন এর জন্য কোন বিশেষ এলাকা চিহ্নিত করতে সক্ষম হননি। স্বভাবতই এমন একটি অসৎ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত আব্দার তুজমানের পক্ষে

মেনে নেওয়া সম্ভব বা সহজ কোনটিই ছিল না। কিন্তু মিলোসেভিচ গং এত সহজে ছাড়বার পাত্র ছিলেন না।

ক্ষমতারোহনের দুই মাস পর তুজমান তার খসড়া সংবিধানে ক্রোয়েশিয়াকে 'ক্রোয়াটদের জাতীয় রাষ্ট্র'- হিসেবে ঘোষণা করলে নীন শহরের সার্ব মেয়র বাবিচ এর নেতৃত্বে সশস্ত্র সার্ব বিদ্রোহের সূচনা হয়। এটি কোন স্বতস্ফূর্ত বিদ্রোহ ছিল না বরং ছিল একটি পূর্বপরিকল্পিত নীল নকশার অংশ। বাবিচ ছিলেন চসিচ মিলোসেভিচ চক্রের খাস লোক। তিনি একরকম জোর করেই স্থানীয় সার্বদেরকে বিদ্রোহের পথে টেনে নামান। কোরেনিকা অঞ্চলের সার্ব নেতৃবৃন্দ বাবিচ এর উস্কানিতে সাড়া না দিয়ে তুজমান সরকারের সাথে সহযোগিতার নিদর্শন স্বরূপ এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে তুজমান প্রশাসনের স্থানীয় সরকার মন্ত্রীকে নিজ এলাকায় আমন্ত্রণ করেন। তাদের আলোচ্য বিষয়ের মাঝে মূখ্য ছিল স্থানীয় প্লিটভাইস ন্যাশনাল পার্কটির উন্নয়ন। এই পার্কটি ছিল ক্রোয়েশিয়ার অন্যতম পর্যটন আকর্ষণ। স্থানীয় সার্ব নেতৃবৃন্দ পার্কটির অধিকতর উন্নয়নের মাধ্যমে অধিক সংখ্যক বিদেশী পর্যটক আকর্ষণের ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু অনুষ্ঠিতব্য আলোচনা সভার পূর্ব রাতে বাবিচ কর্তৃক প্রেরিত চল্লিশজন অস্ত্রধারী স্থানীয় পার্টি অফিস দখল করে নেয় এবং সপ্তাহব্যাপী সন্ত্রাসী কার্যকলাপের মাধ্যমে স্থানীয় নেতাদেরকে বহিস্কার করে সেখানে নিজ কর্তত্বাধীন লোকদেরকে প্রতিস্থাপন করে। এ বৎসরের জুলাই মাসে বাবিচ ক্রাজিনা এলাকার সার্ব অধ্যুষিত পৌরসভাগুলিকে নিয়ে একটি সার্ব পৌরএলাকা সমূহের এসেম্বলী- গঠনের উদ্যোগ গ্রহন করে একটি স্বায়ত্তশাসিত সার্ব অঞ্চল প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পান। এটাই কালক্রমে নীন বিদ্রোহ এর রূপ লাভ করে। এভাবে তিনি রাশকোভিচ এর 'সাংস্কৃতিক স্বায়ত্ত্বশাসন'-এর দাবিটিকে একটি আঞ্চলিক রূপদানে সক্ষম হন। মে মাসে নীন পুলিশ বাহিনী জাগ্রেভ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

১২ই আগষ্ট বাবিচ মিলোসেভিচের নির্দেশক্রমে ঘুর্নেয়মান যুগোস্লাভ ফেডারেল প্রেসিডেন্সীর সার্বিয় প্রতিনিধি বরিসাভ যোভিচ এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। ঘুর্নেয়মান প্রেসিডেন্সীর নিয়ম

অনুযায়ী যোভিচ এই সময়ে যুগোস্লাভ প্রেসিডেন্টের পদ অলংকৃত করেছিলেন। এই সাক্ষাতে তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুগোস্লাভিয়ার তৎকালীন ফেডারেল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গ্রাচানিন। এই বৈঠকে বাবিচ যুগোস্লাভ কেন্দ্রীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে সর্বপ্রকার সহযোগিতার আশ্বাস লাভ করেন। পরদিন যুগোস্লাভিয়ার ফেডারেল সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গ্রাচানিন ক্রোয়েশিয়া প্রজাতন্ত্র সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বোলজাকোভাককে টেলিফোন মারফৎ নীনস্থ বিদ্রোহী পুলিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ না করার জন্য কড়া নির্দেশ দেন। বেলগ্রেড থেকে সর্বপ্রকার সাহায্যের আশ্বাস পেয়ে বাবিচ এবার চূড়ান্ত ব্যবস্থা হিসেবে ১৯শে আগষ্টকে সার্ব স্বায়ত্তশাসন সংক্রান্ত গণভোটের তারিখ হিসেবে ঘোষণা করেন। গণভোটের অনুষ্ঠানটি স্বভাবতই আইনসিদ্ধ ছিল না। ১৭ই আগষ্ট ক্রোয়েশিয়ার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয় নীন এলাকায় পুলিশী অভিযান প্রেরণের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। খবর পেয়ে নীন ও পার্শ্ববর্তী শহরগুলির বিদ্রোহী পুলিশ বাহিনী স্থানীয় জনগণের মাঝে অস্ত্র বিতরণ করে প্রতিরোধ যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। যুগোস্লাভ ফেডারেল সেনাবাহিনী যে.এন.এ-এর স্থানীয় কমান্ডার পূর্ব থেকেই জনগণের মাঝে অস্ত্র বিতরণের প্রক্রিয়া চালু রেখেছিল। সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হয়ে বাবিচ নীনস্থ সার্ব বেতার থেকে ক্রোয়েশীয় পুলিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে অনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

বেলগ্রেড বেতার থেকে যথারীতি নীন বেতারের প্রতিধ্বনি প্রচারিত হয়। আতঙ্কগ্রস্থ স্থানীয় জনগণ তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে পাহাড় জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করে। পুরো ঘটনাই পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী চলতে থাকে। ক্রোয়েশীয় পুলিশ বাহিনী নীন পৌছবার আগেই অচরোভাক শহরের মেয়রের আহ্বানে সাড়া দিয়ে যুগোস্লাভ পিপলস আর্মি যে.এন.এ-নীন এলাকা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। একটি বুলেটও খরচ না কের সফল হয়ে গেল বাবিচ এর ১৭ই আগষ্টের বিপ্লব। ক্রোয়েশীয় পুলিশ বাহিনীর বিরুদ্ধেযে.এন.এ-জঙ্গী বিমান ব্যবহার করে অবশেষে এলাকার কর্তৃত্ব গ্রহণে সক্ষম হল। নির্দিষ্ট হয়ে গেল সার্ব স্বায়ত্তশাসনাধীন এলাকা। এর সব কিছুই ঘটতে লাগল যুগোস্লাভিয়ার সার্ব ফেডারেল প্রেসিডেন্ট ও সশস্ত্রবাহিনীর শাসনতান্ত্রিক সর্বাধিনায়ক বরিসাভ যোভিচ এর নির্দেশে। একটি প্রজাতন্ত্রের মাঝে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে

দিয়ে তারা নাকি যুগোস্লাভিয়ার অখন্ডতা রক্ষা করেছিলেন। গণতন্ত্র আর সাংবিধানিক আইনের শীর্ষ গুরুরা লন্ডন ওয়াশিংটনে বসে অবলীলায় মিলোসেভিচ গংদের এই দাবি মেন নিলেন।

নীন যে.এন.এ এ-অভিযান পরিচালিত হবার মাঝ দিয়ে যুগোস্লাভিয়ার আভ্যন্তরীন রাজনীতি একটি অবশ্যম্ভাবী সামরিক সংঘর্ষের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। যুগোস্লাভিয়ার প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা ও তার ব্যবস্থাপনা ছিল দুই ধাপ বিশিষ্ট। প্রথম ধাপে ছিল যুগোস্লাভ পিপলস আর্মি বা যে.এন.এ। নিয়মিত বাহিনী হিসেবে যে.এন.এ সরাসরি যুগোস্লাভ ফেডারেল সরকারের নিয়ন্ত্রনাধীন ছিল। দ্বিতীয় ধাপে ছিল 'টেরিটোরিয়াল ডিফেন্স ফোর্সেস'- সংক্ষেপে টি.ও গুলি। প্রতিটি প্রজাতন্ত্রের নিজস্ব টি.ও গুলির কাঠামো ছিল। প্রজাতন্ত্রের প্রতিটি সক্ষম নাগরিকই টি.ও গুলির বাহিনীর রিজার্ভ হিসেবে তালিকাভূক্ত ছিল। এগুলি কোন নিয়মিত বাহিনী ছিল না। টি.ও গুলির ঊর্ধ্বতন অফিসারেরা সবাই যে.এন.এ এর নিয়মিত অফিসার ছিলেন, যারা ডেপুটেশনের ভিত্তিতে মাঝে মাঝে টি.ও গুলির অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। টি.ও গুলির রিজার্ভেরা সবাই নিজ নিজ বেসামরিক পেশায় নিয়োজিত থাকতেন। প্রতিটি বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানে এবং পৌরসভা গুলির আওতায়ও একটি করে টি.ও ইউনিট থাকত। সারা দেশ জুড়ে এদের অস্ত্র সম্ভারের গুদাম ছিল। যুগোস্লাভিয়ার দীর্ঘ মেয়াদি প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা ছিল এ রকম যে, শক্ররাষ্ট্র কর্তৃক আক্রান্ত হলে প্রতিটি টি.ও গুলি ইউনিটের রিজার্ভ যোদ্ধাগণ নিজ নিজ ইউনিটে রিপোর্ট করবেন এবং যে.এন.এ এর নিয়মিত যোদ্ধারা প্রতিরোধ না করতে পারেন, তবে দীর্ঘমেয়াদি গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমেই দেশ শক্রমুক্ত হবে। তবে টি.ও গুলির অস্ত্র সম্ভার গুলি স্বভাবতই ছিল হালকা ধরণের, চলমান গেরিলা যুদ্ধের উপযোগী।

স্লোভেনিয়ার প্রথম বহুদলীয় নির্বাচন কুচানের নেতৃত্বে নতুন জাতীয়তাবাদী পার্টি ক্ষমতায় আসার পরপরই যে.এন.এ সতর্কতা অবলম্বন করে এবং কুচান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের দুই দিনের মাথায় সমস্তস্লোভেন টি.ও গুলির অস্ত্রাগার সমূহ দখল করে নিতে শুরু করে। স্লোভেন সরকারের গোচরে আসার পূর্বেই যে.এন.এ প্রজাতন্ত্রের টি.ও গুলির শতকরা ৭০ ভাগ অস্ত্রশস্ত্র

দখল করে নিতে সক্ষম হয়। কুচান সরকার ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করে অবশিষ্ট টি.ও গুলি অস্ত্রাগার গুলির উপর পুলিশী প্রহরা নিযুক্ত করে। কিন্তু তখন স্লোভেন টি.ও গুলি বাহিনীর ৭০০০০ রিজার্ভের জন্য মাত্র ১০০০০ হাল্কা অস্ত্র অবশিষ্ট ছিল। সংঘর্ষ অনিবার্য জেনে স্লোভেন স্বরাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী যৌথ প্রচেষ্টায় বিদেশ থেকে অস্ত্র সংগ্রহের প্রচেষ্টা শুরু করেন, এবং তিন মাসের মধ্যেই ২০০০০ সৈন্য সম্বলিত একটি বাহিনী গড়ে তুলতে সক্ষম হন। সেপ্টেম্বর মাসে যুগোস্লাভ ফেডারেল সরকারের প্রতিরক্ষামন্ত্রী, মিলোসেভিচের অন্যতম সহযোগী জেনারেল কাদিযোভিচ গোটা যুগোস্লাভিয়ায় যে.এন.এ এর নিয়ন্ত্রনের বাইরে সর্ব প্রকার সামরিক তৎপরতাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। স্লোভেনিয়া বেলগ্রেড অনুগত সমস্ত টি.ও কমান্ডারগণকে বরখাস্ত করলে প্রত্যুত্তরে ৪ঠা অক্টোবর যে.এন.এ লবজানাস্থ টি.ও সদর দফতর দখল করে নেয়। কিন্তু ইতোমধ্যেই স্লোভেন সরকার গোপন তৎপরতার মাধ্যমে মাঝারি থেকে ভারী অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে ফেলেছেন। এ মাসের শেষের দিকে স্লোভেনিয়ার পূর্ণ সার্বভৌমত্ব সংক্রান্ত গণভোটকে সামনে রেখে স্লোভেন সরকার তার প্রজাতান্ত্রিক সশস্ত্র বাহিনীর একটা মহড়া প্রদর্শনের আয়োজন করে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল বেলগ্রেডকে বুঝিয়ে দেওয়া যে.এন.এ-এর সামরিক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলার ক্ষমতা স্লোভেনিয়ার রয়েছে। তার এই অনুষ্ঠান দ্বারা আন্তর্জাতিক বিশ্বকেও জানিয়ে দিতে চাইলেন যে, বেলগ্রেড সরকারের সামরিক হস্তক্ষেপ এই এলাকায় একটি অনিবার্য যুদ্ধকে ডেকে আনবে।

স্লোভেনিয়ার এই পদক্ষেপ ক্রোয়েশিয়াকে বিপাকে ফেলে দেয়। তুজমান সরকার ক্রোয়েশিয়ার ক্ষমতা গ্রহণের পূর্বেই যে.এন.এ-ক্রোয়েশীয় টি.ও গুলির সমস্ত অস্ত্রই দখল করে নেয়। ফলতঃ ক্রোয়েশিয়ার কাছে পুলিশ বাহিনীর কাছে পুলিশ বাহিনীর ১৫০০০ রাইফেল ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। গত্যন্তর না দেখে ক্রোয়েশীয় সরকার প্রজাতন্ত্রের পুলিশ বাহিনীকে নিয়মিত সেনাবাহিনীতে রূপান্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই বাহিনীর নতুন নামকরণ করা হয় 'ক্রোয়েশিয়ান ন্যাশনাল গার্ড'। কিন্তু অস্ত্র সংগ্রহ করা ছাড়াও ক্রোয়েশীয় পুলিশ বাহিনীতে সার্ব সংখ্যাধিক্য প্রজাতন্ত্র সরকারের জন্য এক প্রকট সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। বাধ্য হয়ে তুজমান

সরকারকে পুলিশ বাহিনীকে সার্ব মুক্ত করার পদক্ষেপ হিসেবে বাহিনীর সার্ব জাতিভূক্ত সদস্যদেরকে চাকরিচ্যুত করতে হয়। পদক্ষেপটি ক্রোয়েশীয় সার্ব জাতীয়তাবাদকে প্রচন্ডভাবে নাড়া দিয়ে যায়। এই অবস্থায় সাবেক যে.এন.এ জেনারেল মার্টিন স্পেগেলেজ ক্রোয়েশিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত হন। ডিসেম্বর মাস নাগাদ গোপন অস্ত্র সংগ্রহ ও দেশজুড়ে প্রশিক্ষণ শিবির স্থাপনের মাঝ দিয়ে তিনি মোটামুটি একটি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা খাড়া করতে সক্ষম হন। চূড়ান্ত বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে তিনি গোপনে যে.এন.এ এর অভ্যন্তরে অবস্থানরত ক্রোয়াট অফিসার ও জোয়ানদেরকে সতর্ক করে দেন। স্বাধীনতাকামী প্রতিটি নেতৃত্বের জন্য যেটি অবশ্যকর্তব্য। যুগোস্লাভ ফেডারেল প্রতিরক্ষামন্ত্রী জেনারেল কাদিযোভিচ অবিলম্বে ক্রোয়েশিয়ার সামরিক অভিযান চালানোর পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু যে.এন.এ এর কোন অভিযানের অনুমোদন দানের ক্ষমতা একমাত্র আট সদস্য বিশিষ্ট ফেডারেল প্রেসিডেন্সীর হাতে ন্যস্ত ছিল।

১৯৯১ সালের ৯ই জানুয়ারী এই প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্সীর জরুরী সভা আহ্বান করা হয়। স্বভাবতই সার্বিয়ার প্রতিনিধি যোভিচ প্রস্তাবটি পেশ করেন। প্রস্তাবটি পাশ হবার জন্য কমপক্ষে পাঁচটি ভোটের প্রয়োজন ছিল, যার মধ্যে চারটি ইতোমধ্যেই মিলোসেভিচের পকেটস্থ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ করে বসনীয় প্রতিনিধি বোজিচ বোজিচোভিচ প্রস্তাবটির বিরোধীতা করে বসায় সেটি আর পাশ হওয়া সম্ভব ছিল না। অবশেষে সর্ব সম্পতিক্রমে একটি আপোষ প্রস্তাব গৃহিত হয়। এই প্রস্তাবে ক্রোয়েশিয়ার সমস্ত বে-আইনি আধা-সামরিক বাহিনীকে তাদের অস্ত্র সমর্পণের জন্য দশ দিন সময় দেওয়া হয়। শুধুমাত্র ক্রোয়েশিয়ার সদস্য মেসিচ এবং স্লোভেনিয়ার দ্রাভশেক প্রস্তাবটির বিপক্ষে ভোট দেন। ছয়-দুই ভোটে প্রস্তাবটি গৃহিত হয়। কিন্তু দশ দিনের সময়সীমার সাত দিন পার হয়ে যাবার পরও ক্রোয়েশিয়ায় কোন অস্ত্র জমা পড়ল না। ১৭ই জানুয়ারী যুগোস্লাভিয়ায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ওয়ারেন জিমারম্যান যুগোস্লাভ ফেডারেল প্রেসিডেন্সীর তৎকালীন প্রধান নির্বাহী সার্বিয়ার প্রতিনিধি যোভিচকে জানিয়ে দিলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুগোস্লাভ প্রজাতন্ত্রগুলির অভ্যন্তরীন ব্যাপারে ফেডারেল সরকারের সামরিক শক্তি প্রয়োগকে সমর্থন করে না। এদিকে দশদিন সময়সীমার অতিরিক্ত আরো দুই দিন পার হয়ে

গেল, কিন্তু ক্রোয়েশিয়ার কোন অস্ত্র জমা পড়ে নাই। বারো দিনের মাথায় যুগোস্লাভ প্রেসিডেন্সীর ক্রোয়েশীয় সদস্য মেশিচ টেলিফোন মারফৎ যোভিচকে জানিয়ে দেন যে, ক্রোয়েশিয়ার বে-আইনি আধা সামরিক বাহিনী বলতে শুধুমাত্র ক্রাজিনা এলাকার সার্ব বিদ্রোহীদেরকেই বুঝায়। সুতরাং ক্রোয়েশিয়ার ন্যাশনাল গার্ডদের অস্ত্র সমর্পণের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

২৪ শে জানুয়ারী ক্রোয়েশিয়ার প্রশ্ন নিয়ে আবার ফেডারেল প্রেসিডেন্সীর সভা আহুত হয়। কিন্তু ইতোমধ্যে মিলোসেভিচ যে তার প্রথম কৌশল ছেড়ে দ্বিতীয় কৌশলের উপর ভর করছেন, কাদিযোভিচ বা যোভিচের তা জানা ছিল না। প্রকৃতপক্ষে তারা মিলোসেভিচের হাতের পুতুল ছাড়া আর কিছুই ছিলেন না। মিলোসেভিচ ইতোমধ্যে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, যুগোস্লাভিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের অধিকার শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট জাতি সত্তা গুলিরই রয়েছে, কোন বিশেষ প্রজাতন্ত্রের নয়। তিনি আরা ঘোষণা করেন যে, যুগোস্লাভ ফেডারেল রাষ্ট্র কাঠামোর মাঝে প্রজাতান্ত্রিক সীমারেখাগুলি রয়েছে, তা প্রশাসনিক সীমারেখা মাত্র এর কোন জাতিগত বৈশিষ্ট্য নেই। যদি যুগোস্লাভিয়ার ফেডারেল রাষ্ট্র কাঠামোকে ভেঙ্গে দেওয়া হয় তাহলে প্রজাতন্ত্রগুলির মধ্যকার সীমান্তগুলির কোন আইনগত বৈধতা থাকে না। অথচ এই একই ব্যক্তি যখন তার প্রথম কৌশল প্রয়োগ করছিলেন তখন তিনি কসোভোর আলবেনীয় জাতিসত্ত্বাভূক্ত মুসলমানদেরকে সামান্য আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার টুকুও দিতে প্রস্তুত ছিলেন না, যদিও তারা ছিল সেখানকার মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯০ভাগ। দ্বিতীয় কৌশলে এসে তিনি প্রকারান্তে বলতে চাইলেন যে, সমগ্র যুগোস্লাভিয়ায় ছড়িয়ে থাকা সার্ব জাতির একটি বা একাধিক রাষ্ট্র গঠনের অধিকার রয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে প্রজাতন্ত্রগুলির প্রশাসনিক সীমান্তরেখা কোন অন্তরায় হতে পারবে না। তিনি সুকৌশলে বৃহত্তর সার্বিয়া-র তত্ত্বটি তুলে ধরলেন মাত্র। অথচ জাতিগতভাবে স্বতন্ত্র কসোভোদেরকে তিনি সার্বিয়া প্রজাতন্ত্রের প্রশাসনিক সীমান্তের এর মাঝেই বেঁধে রাখলেন। সেখানে তার নতুন তত্ত্ব প্রযোজ্য হল না। ২৪শে জানুয়ারির ফেডারেল প্রেসিডেন্সীর সবার প্রাক্কালে তিনি প্রেসিডেন্সীর স্লোভেন প্রতিনিধি দ্রোভশেক ও স্লোভেন

প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট কুচানকে গোপনে জানিয়ে দেন যে, যেহেতু স্লোভেনিয়ার কোন সার্ব বাস কর না সেহেতু স্লোভেনিয়া একটি একক জাতিসত্তার প্রতিনিধিত্ব করে এবং যুগোস্লাভিয়া থেকে বেরিয়ে যাবার অধিকার সংরক্ষণ করে। কিন্তু যেহেতু ক্রোয়েশিয়া প্রজাতন্ত্র একটি একক জাতিসত্তার প্রতিনিধিত্ব করে না, সেহেতু সেখানে বসবাসরত সার্ব জনগোষ্ঠীকে নিয়ে যুগোস্লাভিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার অধিকার ক্রোয়েশিয়া প্রজাতন্ত্র সরকারের নেই। ক্রোয়েশিয়া যদি নিতান্তই যুগোস্লাভিয়া থেকে বেরিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তবে তাকে সার্ব অধ্যুষিত এলকাগুলি ছেড়ে যেতে হবে, এটাই ছিল মিলোসেভিচের দাবি। ২৫শে জানুয়ারি মিলোসেভিচ যুগোস্লাভ পিপলস আর্মির সর্বাধিনায়ক হিসেবে যোভিচকে টেলিফোন মারফৎ ক্রোয়েশিয়ার নীন অঞ্চলের বিদ্রোহী সার্বদের প্রতিরক্ষার স্বার্থে সামরিক অভিযান প্রেরণের জন্য প্রেসিডেন্সীর আরো একটি সভা অনুষ্ঠানের পরামর্শ দেন। এই সভায় ফেডারেল প্রতিরক্ষামন্ত্রী জেনারেল কাদিযোভিচ সামরিক অভিযানের সপক্ষে জোরালো বক্তব্য পেশ করেন। কিন্তু এবারো বসনীয় প্রতিনিধির অসম্মতির কারনে প্রস্তাবটি পাশ হতে পারেনি। এই অবাধ্যতার ফল অবশ্য বসনিয়াকে কড়ায় গন্ডায় শোধ করতে হয়েছিল।

পৃথিবীর অন্যান্য একনায়কদের মত মিলোসেভিচের জনপ্রিয়তাও বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। যুগোস্লাভিয়ায় যা ঘটে যাচ্ছিল সে ব্যাপারে গোটা পশ্চিমা বিশ্ব মিলোসেভিচকে নীরব সমর্থন দিয়ে গেলেও খোদ সার্বিয়ার সচেতন ছাত্র জনতা তাদের দেশের এই করুন চিত্র বেশি দিন আলস্য বরে দেখেননি। পশ্চিমা পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের সমর্থকরা যদি বলেন যে, কমিউনিজম থেকে গণতন্ত্র উত্তরণের স্বার্থে তারা মিলোসেভিচকে নীরব সমর্থন দিয়ে যাচ্ছিলেন, সে দাবি ভুল হবে। আবার তারা যদি এই দাবি করেন যে, তারা যুগোস্লাভিয়ার অখন্ডতা রক্ষার জন্য মিলোসেভিচকে মুক্ত হস্তে প্রদান করেছিলেন যে দাবিও ভুল, কারণ খোদ সার্বিয়ার ছাত্র জনতাই প্রমান করেছেন যে, মিলোসেভিচ গণতন্ত্রের পথ একেবারে রুদ্ধ করে দিয়েছিলেন এবং তারই একের পর এক পদক্ষেপের কারণে যুগোস্লাভিয়া ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছিল। মিলোসেভিচ চাইলে যুগোস্লাভিয়ার প্রজাতন্ত্রগুলি শান্তিপূর্ণ ভাবে পৃথক হয়ে যেতে পারত অথবা

একটি কনফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত করে টিকে থাকতে পারত। কিন্তু অপর প্রজাতন্ত্রের অঙ্গচ্ছেদ করে 'বৃহৎ সার্বিয়া'- গঠনের একনায়কোচিত স্বপ্ন সমস্ত সম্ভাবনা গুলিকেই নাকচ করে দিচ্ছিল। ১৯৯১ সালের গোড়ার দিকেই সার্বিয়ার ছাত্র জনতার ভুল ভাঙ্গে। তারা বুঝতে পারে যে, সার্বিয়ার মাটিতে এক ফ্রাঙ্কেনষ্টাইনের জন্ম হয়ে গেছে। দেরিতে হলেও তারা এই ফ্রাঙ্কেনষ্টাইনের ধ্বংসযজ্ঞ রোধ করার চেষ্টা শুরু করেন। মার্চ মাস নাগাদ সার্বিয় ছাত্র জনতা চূড়ান্তভাবে বিক্ষুব্ধ এ বিদ্রোহী হয়ে উঠলে মিলোসেভিচ গং আরো বেশি সামরিক শক্তি নির্ভর হয়ে উঠতে থাকে। ১৯৯১ সালের মার্চ মাসে সার্বিয় ছাত্র জনতা যুগোস্লাভিয়ার অখন্ডতা রক্ষার উদ্দেশ্যে মিলোসেভিচের অগণতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে প্রচন্ড বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তারা বুঝতে সক্ষম হয় যে, সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রচার মাধ্যমগুলি এতদিন তাদেরকে বোকা বানিয়ে রেখেছিল। বিক্ষোভ যে সমাগত তা মিলোসেভিচ গং আগে থেকেই জানতেন এবং এ ব্যাপারে তার কর্তব্যকর্ম ঠিক করে রেখেছিলেন। বিক্ষোভ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছবার আগেই তারা প্রেসিডেন্সীর সদস্যদের কাছ থেকে সেনাবাহিনী ব্যবহারের অনুমতি নিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু সেনাবাহিনী ব্যবহারের মাত্রা যে বেলগ্রেডের রাজপথে ছাত্র-জনতার বিরুদ্ধে যে.এন.এ ট্যাঙ্ক ব্যবহার পর্যন্ত গড়াবে তা প্রেসিডেন্সীর অন্তত অর্ধেক সদস্য জানতেন না। ছাত্র জনতার তুমুল বিক্ষোভের সামনে মার্চ মাস নাগাদ মিলোসেভিচ গং এর ক্ষমতায় টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

৯ই মার্চ মিলোসেভিচের কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন কালে পুলিশ সতের বৎসর বয়স্ক এক তরুন ছাত্রকে গুলি করে হত্যা করলে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। ক্রুদ্ধ ছাত্র-জনগণ প্রেসিডেন্টের অফিস আক্রমণ করে ভাংচুর করে এবং বেলগ্রেড শহরের সমস্ত রাজপথ দখল করে নেয়। রাস্তার মোড়ে এবং বড় বড় স্কোয়ার গুলিতে জনতার মঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়। লক্ষ লক্ষ ছাত্র জনতা পুলিশের নিরাপত্তা বেষ্টনী সমূহ ভেঙ্গে ফেলে। অবশেষে মিলোসেভিচ সার্বিয়ান অর্থোডক্স চার্চের শরণাপন্ন হন। কিন্তু চার্চের পুরোহিতেরাও বিক্ষুব্ধ জনতাকে শান্ত করতে ব্যর্থ হলে মিলোসেভিচ ১১ই মার্চ আপোষ আলোচনার প্রস্তাব করেন।

মিলোসেভিচ বুঝতে পারছিলেন যে, অবিলম্বে ক্রোয়েশিয়া ও স্লোভেনিয়ার যুদ্ধ শুরু না করতে পারলে তার পক্ষে ক্ষমতায় টিকে থাকা সম্ভব হবে না। আলোচনা কালে তিনি সুকৌশলে স্লোভেনিয়া ও ক্রোয়েশিয়ার প্রসঙ্গ তুলে ছাত্র প্রতিনিধিদেরকে উত্তেজিত করে তাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করার চেষ্টা করলে জনৈক ছাত্র প্রতিনিধি প্রত্যুত্তরে বলেন যে, সার্বিয়ায় মিলোসেভিচ পদত্যাগ করলেই অন্যান্য প্রজাতন্ত্রের বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতারা তাদের জনসমর্থন হারাবেন, সুতরাং যুগোস্লাভিয়ার অখন্ডতা রক্ষার খাতিরে মিলোসেভিচকে অবিলম্বে পদত্যাগ করে গণতন্ত্র ও জাতীয় সংহতির পথ সুগম করা উচিৎ। আলোচনা সভা ঘিরে থাকা হাজার হাজার ছাত্র জনতা তখন বাইরে মিলোসেভিচকে 'সাদ্দাম' বলে স্লোগান দিচ্ছিল। তাদের অভিযোগ ছিল যে, এই ব্যক্তিটি তাদের দেশটিকে যুদ্ধের পথে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। আলোচনায় ব্যর্থ হলে মিলোসেভিচ নতুন কৌশল অবলম্বন করলেন। যুগোস্লাভ প্রেসিডেন্সীতে তার বশংবদ সার্বিয় প্রতিনিধিকে তিনি পুনরায় ক্রোয়েশিয়ার সামরিক অভিযানের সপক্ষে প্রস্তাব আনার পরামর্শ দিলেন। তার উদ্দেশ্য ছিল, ক্রোয়েশিয়ায় যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়ে গোটা দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে সামরিক শক্তির বলে ক্ষমতায় টিকে থাকা। ১২ই মার্চ প্রেসিডেন্সীর সভা আহ্বান করা হয়।

সভাটি ছিল প্রকৃতপক্ষে বাহানা মাত্র। আসল কর্তব্যকর্ম মিলোসেভিচ-কাদিযোভিচ গং আগেই ঠিক করে রেখেছিলেন। তিন মাস পূর্বেই তারা গোপনে এ্যাডমিরাল মাসুলাকে লন্ডনে, জেনারেল ব্লাগোজ আদজিচকে প্যারিসে এবং এ্যাডমিরাল ষ্টেন ব্রোভেটকে মস্কো পাঠিয়ে যুগোস্লাভিয়ায় সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানোর সম্মতি নিয়ে রেখেছিলেন। লক্ষ্যণীয় বিষয় এটাই যে, পশ্চিমা গণতন্ত্রীদের ভন্ডামী অবশ্যই প্রকাশ পায় কিন্তু তা দেরিতে, যে গড়িয়ে যাওয়া সময়ের ব্যবধানে সমস্যা পীড়িত পৃথিবী তখন অন্য কিছু নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সবই পশ্চিমা মিডিয়াগুলির তেলেসমাতি।

১২ই মার্চ যুগোস্লাভ প্রেসিডেন্সীর সমস্ত সদস্যগণকে যে.এন.এ এর বাসে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় বেলগ্রেড শহর থেকে দুরে একটি সামরিক কমান্ড ব্যাঙ্কারে। হিমাঙ্কের নিচে তাপমাত্রার মাঝে বরফশীতল কক্ষে প্রেসিডেন্সীর সভা বসে। প্রেসিডেন্সীর সকল সদস্যই তখন শীতে ঠকঠক করে কাঁপছিলেন। এমন পরিস্থিতির জন্য কেউই প্রস্তুত ছিলেন না। পুরো মঞ্চটিই যেন সাজান হয়েছিল প্রেসিডেন্সীর সদস্যদের উপর মানসিক চাপ প্রয়োগের জন্য। প্রেসিডেন্সীর সমস্ত সদস্যদেরই তখন মনে হচ্ছিল তারা যেন সেদিন জেনারেল কাদিযোভিচ এর হাতে বন্দি। এমনই পরিস্থিতিতে প্রেসিডেন্সীর তৎকালীন চেয়ারম্যান সার্বিয় প্রতিনিধি যোভিচ ক্রোয়েশিয়ায় সামরিক অভিযানের প্রস্তাবটি পেশ করলেন। কিন্তু এবারো প্রস্তাবটি চার ভোটের বেশি সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হল। ১৩ই মার্চ মিলোসেভিচ বাধ্য হয়ে ছাত্র জনতার সাথে কিছু মামুলি বিষয়ে আপোষরফা করলেন, কিন্তু ভুলেও নিজ পদত্যাগের প্রসঙ্গটি তুললেন না। তিনি জানতেন আসল খেলা শুরু হলে উগ্র জাতীয়তাবাদের জ্বরে সার্ব জনতা সবকিছু ভুলে যাবে। ওদিকে ১২ই মার্চের রাত্রে জেনারেল কাদিযোভিচ পুনরায় মস্কো সফর করে শুধু তৎকালীন ক্রেমলিন সরকারই নয় বরং উদীয়মান রুশ নেতা বরিস ইয়েলেৎসিনের সবুজ সংকেত নিয়ে এলেন। কাদিযোভিচ এই সময়ে মিলোসেভিচকে এও জানালেন যে, গরবাচেভের সময় আর বেশি নেই।

১৪ই মার্চের প্রেসিডেন্সীর সভায়ও ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের প্রস্তাবটি পাশ না হওয়ায় ক্রুদ্ধ যোভিচ এক ভয়ঙ্কর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বসলেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, যুগোস্লাভ প্রেসিডেন্সীই যদি ক্রোয়েশিয়ার সামরিক অভিযানের সামনে প্রধান বাধা হয়ে থাকে তবে তিনি এই প্রেসিডেন্সীকেই ভেঙ্গে দেবেন। ঐ রাতেই তিনি আট সদস্য বিশিষ্ট যুগোস্লাভ প্রেসিডেন্সীর চেয়ারম্যানের পদ থেকে ইস্তফা দিলেন। তার পরপরই প্রেসিডেন্সীর পদ থেকে ভজভোদিনার বুচিন এবং মন্টিনিগ্রোর কসটিচ পদত্যাগ করলেন। কার্যতঃ ফেডারেল যুগোস্লাভিয়ার আর কোন সাংবিধানিক অস্তিত্ব রইল না। মিলোসেভিচ গং ফেডারেল যুগোস্লাভিয়ার মৃত্যু ঘন্টা বাজিয়ে দিলেন। ১৫ই মার্চের রাত্রে যে.এন.এ সুপ্রীম কমান্ড ঘোষণা করল যে, যেহেতু যুগোস্লাভ ফেডারেল প্রেসিডেন্সীর আর কোন অস্তিত্ব নেই সেহেতু যুগোস্লাভ

সেনা বাহিনীই এখন একমাত্র ফেডারেল প্রতিষ্ঠান যা যুগোস্লাভিয়ার ফেডারেল সরকারের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে এবং প্রয়োজনবোধে সেনা প্রধান যে, কোন উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। পরদিন মিলোসেভিচ ঘোষণা করলেন, যুগোস্লাভিয়া আর নেই। তিনি আরো ঘোষণা করলেন যে, সার্বিয়া আর এখন থেকে ফেডারেল সরকারের কোন নির্দেশ মানতে বাধ্য নয়। একই সময়ে তিনি সার্ব জাতির একটি নিজস্ব বাহিনী গঠনের ঘোষণা দেন, যা তিনি পরবর্তীতে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। ঐ একই দিনে নীন এর সার্ব নেতৃত্ব ক্রোয়েশিয়া থেকে তাদের স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করে। কিন্তু এত কিছুর পরেও তিনি সার্বিয়ায় ছাত্র জনতাকে শান্ত করতে ব্যর্থ হলেন।

১৯শে মার্চ তিনি বেলগ্রেডে ছাত্র জনতার ২০০ জন প্রতিনিধির সাথে এক আলোচনায় মিলিত হলেন। পশ্চিমা গণতন্ত্রীরা বুঝতে না চাইলেও বেলগ্রেডের ছাত্র জনতা পরিস্কার বুঝতে পারছিলেন যে, কে বা কারা যুগোস্লাভিয়াকে ধ্বংস করছে। মিলোসেভিচ তাদের সামনে বৃহত্তর সার্বিয়ার পরিকল্পনাটি পেশ করলেন। কিন্তু ছাত্র জনতার প্রতিনিধিরা তার পরিকল্পনাটি প্রত্যাখ্যান তো করলই এমনকি আবারো মিলোসেভিচের পদত্যাগের জোর দাবি জানাল। মিলোসেভিচ বুঝে গেলেন যে, দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করায় সমস্ত পরিকল্পনাই ছাত্র জনতা ব্যর্থ করে দেবে। তিনি তৎক্ষণাৎ তার বশংবদ সার্বিয় পার্লামেন্টকে ফেডারেল প্রেসিডেন্সী থেকে যোভিচ এর পদত্যাগকে রোধ করার হুকুম দিলেন। সার্বিয়ার ছাত্র-জনতা তার যুদ্ধবাজ পরিকল্পনাকে সমর্থন প্রয়োজন যার জন্য যোভিচকে প্রয়োজন। সুতরাং যোভিচকে পদত্যাগ করতে দিলেন না।

মিলোসেভিচের আমন্ত্রণে বেলগ্রেড ও জাগ্রেভের মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত কারাদযোরযোভো নামক স্থানে এক পুরাতন বাগান বাড়িতে মিলোসেভিচ ও তুজমানের মাঝে এক গোপন আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। মিলোসেভিচ আশা করছিলেন, এই আলোচনা তার রাজনৈতিক জীবনে কিছুটা স্থিতিশীলতা বয়ে আনতে পারবে। যদিও তিনি কোনদিনই এই আলোচনার বিষয়বস্তু

জনসমক্ষে প্রকাশ করেন নি। কিন্তু তুজমান এখান থেকে ফিরে গিয়ে অত্যন্ত উৎফুল্ল চিত্তে তার রাজনৈতিক সহকর্মীদেরকে জানিয়েছিলেন যে, সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে গিয়েছে, যে.এন.এ হামলার আর কোন আশঙ্কা নেই মিলোসেভিচ ক্রোয়েশিয়ার স্বাধীনতাকে নীতিগতভাবে মেনে নিয়েছেন, এমনকি এক সপ্তাহ পূর্বে স্বাধীনতা ঘোষণাকারী নীন বিদ্রোহীদের ব্যাপারেও তুজমানকে তার নিজস্ব পদ্ধতিতে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার অনুমতি দিয়েছেন। সম্ভবত এই সময় থেকেই স্বয়ং তুজমানও বৃহত্তর ক্রোয়েশিয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, বৃহত্তর ক্রোয়েশিয়ার মাঝে তিনি ভজভোদিনার অংশবিশেষকেও পাবেন। অবশ্য এ সবই মিলোসেভিচ পরে অস্বীকার করেছিলেন। তবে একটি বিষয়ে যে তারা ঐক্যমত্যে পৌঁছতে পেরেছিলেন, সে বিষয়টি হল বসনিয়া-হার্জেগোভিনার সার্বিয়া ও ক্রোয়েশিয়ার মাঝে বিভাজন। এই একটি বিষয়ে তারা দুই ভাই ভাগ করার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। এই গোপন আলোচনার পর থেকে তুজমানের ভূমিকা আর আগের মত স্বচ্ছ ছিল না। বৃহত্তর ক্রোয়েশিয়ার জ্বর তাকেও সংক্রমিক করে ফেলেছিল। এর পরবর্তী কয়েক মাসে তুজমানের ভূমিকা দেখে তাকেও আর পাতানো খেলা ছাড়া আর কিছু আখ্যা দেওয়া যায় না। আসল শিকার সম্পর্কে দুজনেই একমত হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তার আগে ভনিতা হিসেবে একটু যুদ্ধ যুদ্ধ খেলার প্রয়োজন ছিল। সম্ভবত মস্কো, প্যারিস, লন্ডন ও এই ঐক্যমত্যের সমর্থক ছিল।

১৯৯১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ভজভোদিনার সীমান্ত সংলগ্ন পশ্চিম স্লাভেনিয়ার পাররাফ শহরের পুলিশ ষ্টেশনটি স্থানীয় বিদ্রোহী সার্ব অস্ত্রধারীরা দখল করে নেয় এবং ক্রাজিনাস্থ 'সার্ব স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ' এর প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করে। কিন্তু ২০০ ক্রোয়েশীয় পুলিশ পরদিন বিনা রক্তপাতে পাকরাফ পুলিশ ষ্টেশন পুনরুদ্ধার ও ১৮০ জন বিদ্রোহীকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু বেলগ্রেড বেতার প্রচার করে যে, এই অভিযানে ক্রোয়েশীয় পুলিশ একজন অর্থোডক্স ধর্মযাজক সহ এগারো জন সার্ব বিদ্রোহীকে হত্যা করেছে। নীন এলাকা থেকে সার্ব ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতা রাশকোভিচ ঘোষণা করেন যে, ক্রোয়েশিয়া সার্বদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছে। বেলগ্রেড ও জাগ্রেভ বেতারের মাঝে বাকযুদ্ধ শুরু হয়। জাগ্রেভ বেতার ঘোষণা করে যে, এটি মোটেই দু

পক্ষের লড়াই নয় বরং ক্রোয়েশিয়ার বৈধ সরকারের নিজ এলাকায় বিদ্রোহ দমনের আইন সঙ্গত পদক্ষেপ। যুগোস্লাভ ফেডারেল প্রেসিডেন্ট বরিশাভ যোভিচ ক্রোয়েশিয়ার বিবাদমান পক্ষদ্বয়কে নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য যে.এন.এ মোতায়েনের হুকুম প্রদান করলে এই অভিযান ক্রোয়েশিয়ান ন্যাশনাল হার্ডকে নিরস্ত্র করবার অভিযান নয় বিধায়, তুজমান এই অভিযানের আইনগত বৈধতা চ্যালেঞ্জ করবার প্রয়োজনবোধ করলেন না। তবে যে.এন.এ এর ঘটনার স্থলে পৌঁছবার আগেই ক্রোয়েশীয় পুলিশ বাহিনী অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসায় তাদের আর সেখানে করার কিছু ছিল না।

ফেডারেল প্রেসিডেন্ট এবার উভয় পক্ষকে তাদের পূর্বতন অবস্থানে ফিরে যাবার নির্দেশ দেন এবং উভয় পক্ষ তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। এই মাসের শেষের দিকে সশস্ত্র সার্ব বিদ্রোহীরা প্লিটভাইস ন্যাশনাল পার্কটি দখল করে নেয়। ৩১শে মার্চ ক্রোয়েশীয় পুলিশ বাহিনী পার্কটি পুনরুদ্ধারের অভিযানে বের হয়। উভয় পক্ষে একজন করে হতাহতের বিনিময়ে পার্কটি ক্রোয়েশীয় পুলিশ বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে আসে। স্বভাবতই আবার একদফা বেলগ্রেড বেতারযুদ্ধ হয়ে যায়। বেলগ্রেড ফেডারেল প্রেসিডেন্সীর আরক দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। প্রেসিডেন্সীর নির্দেশ ক্রমে দ্বিতীয় বারের মত যে.এন.এ বাহিনী ক্রোয়েশিয়ায় প্রবেশ করে। প্লিটভাইস পার্কে উপস্থিত হয়ে তারা একমাত্র যে কাজটি করে তা হল আহতদেরকে হেলিকপ্টার যোগে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া। তুজমান নিজেই যুগোস্লাভ সেনাবাহিনীর কাজের প্রশংসা করেন। ক্রোয়েশীয় পুলিশ বিশেষ সার্ব বাহিনীর পোশাক পরিহিত ২৯জন বিদ্রোহীকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। ১৬ই মার্চ তারিখে মিলোসেভিচ যে, বিশেষ সার্ব বাহিনী গঠনের ঘোষণা দিয়েছিলেন এবার সেই বাহিনীর অস্তিত্বের কিছুটা প্রমাণ পাওয়া গেল।

১লা এপ্রিল নীন শহর থেকে পনের মাইল দূরে কিজেভো নামক সার্ব গ্রাম পরিবেষ্টিত ক্রোয়াট শহরে একটি বোমা বিস্ফোরিত হয়। ঐ দিন রাতে নীন শহরে আরো দুইটি পৃথক বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় দুইটি ক্রোয়াট মালিকানাধীন দোকান ধ্বংস হয়। এর পর থেকে ক্রোয়েশিয়ার সার্ব সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা সমূহে এগুলি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। ক্রোয়েশিয়ার গ্রামাঞ্চল তখন আর শান্তিপূর্ণ বসবাসের যোগ্য ছিল না। সার্ব সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলি তখন পুরোপুরি বিশেষ সার্ব বাহিনীর অস্ত্রধারীদের নিয়ন্ত্রণে চলে গিয়েছিল। ক্রোয়েশিয়ার উপর্যপুরি যে.এন.এ এর অভিযান স্লোভেন সরকারকে চিন্তিত করে তোলে। স্লোভেন সরকার প্রধান কুচান অবিলম্বে স্লোভেন গণপরিষদকে পূর্ণ সার্বভৌমত্বের বিল আনয়ন করতে পরামর্শ দেন। ২রা এপ্রিল তুজমান এক ভাষণে যুগোস্লাভিয়াকে একটি কনফেডারেশনে রূপান্তরিত করার পরামর্শ দেন। তবে সেই সাথে তিনি এও যোগ করেন যে, যদি স্লোভেনিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করে তবে তিনিও তৎক্ষণাৎ স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন। ইতোমধ্যে ক্রোয়েশিয়ার অভ্যন্তরে সার্ব বিদ্রোহী এলাকার সংখ্যা ও আয়তন উভয়ই বেড়ে চলতে থাকে। প্লিটভাইস পার্কের ঘটনার পর স্লাভেনিয়ার সার্ব ডেমোক্রেটিক পার্টি নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে স্লোভেনিয়া এলাকাকে সার্বিয়ার সাথে যুক্ত করে দেবার দাবি জানায়।

পাতানো খেলায় পরিকল্পনা করা যত সহজ খেলাটিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা তত সহজ নয়। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে তুজমানের নেতৃত্বাধীন ক্রোয়েশিয়ান ডেমোক্রেটিক ইউনিয়ন (এইচ, ডি, জিড)-এর এক অতি উৎসাহী নেতা, গজকো সুসাকের নেতৃত্বে একদল চি, ডি, জেড পান্ডা দানিউব তীরবর্তী স্লোভেনিয়ার সার্ব অধ্যুষিত গ্রাম বরভোসেলো-র উপর তিনটি রকেট নিক্ষেপ করে। ১ মে রাত্রিতে ক্রোয়েশীয় পুলিশ বাহিনীর চারজন তরুন সদস্য বরভো সেলো গ্রামে অনুপ্রবেশের প্রচেষ্টা চালালে প্রহরারত বিশেষ সার্ব বাহিনীর গুলিতে দুইজন নিহত হয়। বাকি দুইজন কোনমতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসে। কার্যতঃ ক্রোয়েশিয়ার নতুন পুলিশ বাহিনীতে রাজনৈতিক ডামাডোলের মাঝে প্রচুর এ্যাডভেঞ্চার প্রিয় তরুনের সমাগম ঘটে, যারা তাদের পদমর্যাদার তুলনায় অনভিজ্ঞ ও শৃঙ্খলা নীতিবোধ শুন্য ছিল। তুজমান সরকার তাদেরকে

নিয়ন্ত্রণে রাখবার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি। এদেরই একটি দল বাস ভর্তি করে ২ মে সকালে বারভো সেলো গ্রামে প্রবেশ করলে সশস্ত্র সার্ব মিলিশিয়াদের হামলায় আরো ১২জন নিহত হয়। এভাবে দেখা যায়, যুগোস্লাভিয়া ফেডারেশনে মিলোসেভিচ ক্ষমতায় আসার পর তার অত্যাচারে ফেডারেশনে অর্ন্তভূক্ত প্রদেশ গুলো নিজেদেরকে বাঁচানোর চেষ্টা করে। যার ফলে তারা আত্মসচেতন হয়ে উঠে, তার মধ্যে কসোভো অন্যতম। যুগোস্লাভিয়া ফেডারেশনে মিলোসেভিচের গৃহীত নীতিই কসোভোর স্বাধীনতার সংগ্রামের সূত্রপাত ঘটায়।

তথ্য নির্দেশ ও টীকা

১। মোঃ ফায়েক উজ্জামান, 'বসনিয়া হারজেগোভিনা সংকটের প্রেক্ষাপট ও সমাধান', *Rajshahi University Studies*, Part-A, Vol. 27, 1999, p. 63.

২।*The Encyclopedia Americana*, Vol-3, USA, 2001, p-93.

৩। Gerorge Lenczowski, *The Middle East in World Affairs*, 4th edition, London, 1980, p-93.

৪। *Ibid*, p. 91.

৫। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কাল হচ্ছে ১৯৩৯-১৯৪৫ সাল। লীগ অব নেশন্সের ব্যর্থতার ফলেই মূলত ২য় বিশ্বযুদ্ধ হয়। এতে দুটি পক্ষ যথা অক্ষ শক্তি ও মিত্র শক্তির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

৬। ১৯৯০ সালে রাশিয়া তথা সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে ১৫টি নতুন রাষ্ট্রের জন্ম লাভ করে। রাষ্ট্রগুলো হচ্ছে এর ফলে মূলত আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে রাশিয়ার প্রভাব কমতে থাকে।

৭। জাতীয়তাবাদের ইংরেজী প্রতিশব্দ হচ্ছে 'Nationalism' । জাতীয়তাবাদ হচ্ছে একটি মানসিক অনুভূতি, আত্মিক ধারণা । যার মাধ্যমে কোন জাতির রাজনৈতিক ইতিহাস, স্মৃতি, উত্তরাধিকার, ঐতিহ্য এবং আশা-আকাঙ্খার ধারণা আত্মপ্রকাশ করে। তাই সাধারণভাবে বলা হয় জাতীয়তাবাদ এমন একটি ঐক্য সাধনকারী ধারণা, যা অন্য মানবগোষ্ঠী থেকে একটা গোষ্ঠীকে স্বতন্ত্র বলে বিবেচনা করতে সহায়তা করে। এই জাতীয়তাবাদের ইংরেজী প্রতিশব্দ হচ্ছে 'Nationalism'। আর এই জাতীয়তাবাদের চেতনা থেকেই একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়।

৮। *New Standard Encyclopedia Dictionary*, Vol-2, Chicago, p. 54

৯।মিয়া মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, *সমসাময়িক আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি*, ঢাকা, পৃ. ২৫৫।

১০। Philip K. Hitti, *History of the Arabs*, 10th edition, Macmillan Press Ltd, 1970, p-709.

১১। ১৯৯০ সালে কসোভো তাদের প্রথম স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল। এতে তারা তাদের স্বাধীনতার পক্ষে বিশ্ব জনমত সৃষ্টি করতে পারে নি বলে আন্তর্জাতিক মহল থেকে শুধুমাত্র আলবেনিয়া ছাড়া কেউ তাদের স্বীকৃতি দেয় নি।

১২। John L Esposiot, *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, Vol. 1, Oxford University Press, 1995, p. 184.

১৩। http//:en wikipedia.org/wiki/solbodan, milosovia

১৪। Huntington, Samuel P,*The Clash of Civilizations and the Remarking of World Order*, Penguin Books, New Delhi, 1996, p. 22.

১৫। IMF এর পূর্ণরূপ হচ্ছে International Monetory Fund।এই সংস্থাটি ১ জুলাই১৯৪৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর কার্যক্রম শুরু হয় ১ মার্চ ১৯৪৭ সালে। এর সদর দপ্তর অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে। কসোভো এর ১৮৬ তম সদস্য।এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যক্তিগত ও বেসরকারী সূত্র থেকে অর্থ সংগ্রহ করে সদস্য দেশ সমূহের উন্নয়ন প্রকল্পে কারিগরি সাহায্য প্রদান করা।

১৬। global.britanica.com/Battle-of-Kosovo

১৭। স্লোভেদান মিলোসেভিচ ছিলেন একজন উগ্র জাতীয়তাবাদী সার্ব নেতা। বলকান মুসলমানদের প্রতিভার বিরূপনীতি ও নৃশংস কর্মকান্ডের জন্য ইতিহাসে তিনি 'Balkan butcher' হিসেবে পরিচিত। বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে তিনি বলকান উপদ্বীপে বেশ কিছু ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের জন্ম দিয়েছিলেন। ১৯৮৯- ২০০০ সাল পর্যন্ত মিলোসেভিচের মুসলিম বিরোধনীতি যেমন তাকে সমালোচিত করেছে তেমনি তা ইউরোপে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। ২০০০ সালে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর ২০০২ সালের ৩০ জানুয়ারী তিনি একজন যুদ্ধাপরাধী হিসেবে অভিযুক্ত হন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) এ বিচারাধীন ছিলেন। বিশেষ উল্লেখ্য যে, উক্ত ট্রাইব্যুনালটি জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে ২৫ মে ১৯৯৩ সালে গৃহীত Resolution এর অধীনে গঠিত হয়েছিল। এবং এতে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞগণ তাদের মূল্যবান ভূমিকা রাখেন যার ফলে এর ব্যাপক এখতিয়ার গড়ে ওঠে। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৯৯ সালের মে মাসে মিলোসেভিচের বিরুদ্ধে হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণসহ 'Ethnic Cleansing' এর অপরাধে দায়ী করা হয়। যার ফলে তখন থেকেই মিলোসেভিচ একজন যুদ্ধাপরাধী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে

পড়েন। তবে দুর্ভাগ্য যে, বিচারাধীন থাকা কালেই মিলোসেভিচ নিজ কারা কক্ষে ১১ মার্চ, ২০০৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন। ফলে বিশ্ব ব্যাপী তার অপরাধের বিচারের রায় প্রত্যক্ষ করতে পারেনি।

১৮। মঈন বিন নাসির, *সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের স্বরূপ প্যালেস্টাইন থেকে বসনিয়া*, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি, মতিঝিল, ঢাকা,২০০০,পৃ.৮৪।

১৯। ইংরেজীতে (The Balkans) বলতে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের একটি ঐতিহাসিক অঞ্চলকে বুঝায়। 'বলকান' একটি তুর্কী শব্দ যার অর্থ পাহাড়। বলকান উপদ্বীপটি ছিল অত্যন্ত পর্বত সংকুল। বলকান অঞ্চলটি ইউরোপের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে অবস্থিত। স্লোভেনিয়া-ক্রোয়েশিয়া, বসনিয়া-হার্জেগোবিনা, সার্বিয়া, মন্টিনিগ্রো, মেসিডোনিয়া, আলবেনিয়া, রুমানিয়া, ও মোলডোভীয়া নিয়ে বলকান অঞ্চল গঠিত। কিন্তু বলকান উপদ্বীপ বলতে বুঝায় দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের ঐ অংশকে যা কৃষ্ণসাগর, ইজিয়ান সাগর, ভূমধ্যসাগর, আয়োনিয়ান সাগর এবং এ্যাড্রিয়াটিক সাগর দ্বারা আবৃত।

২০। *প্রাগুক্ত*, পৃ.৮৫।

২১। স্টামবোলীট ছিলেন সার্বিয়ার প্রেসিডেন্ট। তিনি ৫ নভেম্বর ১৯৩৬ সালে জন্ম গ্রহন করেন এবং ২৫ আগষ্ট ২০০০ সালে মৃত্যু বরণ করেন। ১৯৮৬ সালের ৫ মে তিনি সার্বিয়ার প্রেসিডেন্ট হন এবং ১৪ ডিসেম্বর ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

কসোভো স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘটনাপ্রবাহ

বিভিন্ন শক্তিবর্গের ভূমিকা

কসোভো স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘটনা প্রবাহ

আধুনিক ইউরোপের বলকান অঞ্চলের রাজনৈতিক ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে, কসোভোর স্বাধীনতা সংগ্রাম একদিনের কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। দীর্ঘদিনের একটি চলমান প্রক্রিয়ার ফলই কসোভোর যুদ্ধ ঘটেছে। আলোচ্য অধ্যায়ে কসোভোর স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘটনা প্রবাহ এবং এতে বিভিন্ন শক্তিবর্গের ভূমিকা ও অংশ গ্রহণ পর্যালোচনা করা হবে।

ঘটনা প্রবাহ: কসোভো সার্বীয় ভাষায় Kocobo।আলবেনীয় ভাষায় Kocovo হচ্ছে ইউরোপের বলকান অঞ্চলের একটি রাষ্ট্র যা পূর্বে সার্বিয়ার একটি প্রদেশ ছিল। সাবেক যুগোস্লাভিয়ার অন্য আরেকটি প্রদেশ হচ্ছে ভজবোদিনা। কসোভো প্রদেশটি ১৯৯৯ সাল থেকে জাতিসংঘ প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে ছিল। যদিও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় প্রদেশটির উপর সার্বিয়ার সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি দিয়েছে, কার্যত এটির উপর সার্বীয় শাসনের প্রয়োগ ছিল নগন্য। ২০০৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দেশটি স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এই স্বাধীনতা প্রশ্নে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ বেশ কিছু দেশ কসোভো রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিলেও রাশিয়াসহ বেশ কতিপয় দেশ এখনও পর্যন্ত স্বীকৃতি দিতে নারাজ।

মুসলিম বিশ্বের তথা আধুনিক বিশ্বের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ২০০৮ ইং সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী কসোভোর স্বাধীনতা ঘোষণা একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা। ১৯৯০ সালে স্লোভেদান মেলোসেভিস কসোভোর প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন হরন করে এবং সার্বিয়ার সরাসরি দখলে চলে আসে।[১] ১৯৯০ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত ছয় বছর ব্যাপী এই শোষণমূলক নীতি অনুসরন করেমিলোসেভিচ। এই সময়কালের মধ্যে পর পর দু'টো গনভোট অনুষ্ঠিত হয় -যথাক্রমে সেপ্টেম্বর ১৯৯১ এবং মে ১৯৯২। উক্ত গনভোটের ফলাফলে শতকরা ৯৮ ভাগ জনগন স্বাধীন কসোভোর পক্ষে রায় প্রদান করে।তবে মেলোসেভিস তার নিষ্পেষণমূলক নীতি অবলম্বন করে উভয় গনভোটের রায়কে বাতিল ঘোষণা করে।[২]

স্লোভেদান মিলোসেভিচের অন্যতম একটি ঘৃণিত পদক্ষেপ হল কসোভোর সংগ্রামী জনগণের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া। কসোভো হচ্ছে সাবেক যুগোস্লাভিয়ার একটি ক্ষুদ্র প্রদেশ। ১৯৮৯ সালে স্লোভেদান মিলোসেভিচ সার্বিয়ার প্রেসিডেন্ট হয়ে কসোভোর স্বায়ত্বশাসন বাতিল করেন এবং কসোভোর জনগনের উপর তীব্র নির্যাতন শুরু করে। ফলে কসোভোর নিষ্পেষিত জনগন প্রখ্যাত লেখক ইব্রাহিম রূগুভা (Ibrahim Rugova) এর নেতৃত্বে ১৯৯৬ সালের এপ্রিল মাসে Kosovo Liberation Army (KLA) গঠন করে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু করে।[৩] KLA এর পাশাপাশি আরও একটি গুপ্ত সংগঠন গড়ে উঠে বুজার বুকোশি (Bujar Bukoshi) এর নেতৃত্বে যার নাম ছিল Armed Forces of the Republic of Kosovo (FARK)। তবে FARK ১৯৯৮ সালে KLA এর সাথে একিভূত হয়ে যায়। বসনিয়ায় যা ঘটেছিল কসোভোতে তারই প্রতিফলন ঘটে। হত্যা, লুন্ঠন ও ধর্ষণ অর্থাৎ Ethnic Cleansing হয়ে উঠে প্রাতদিনের ঘটনা। প্রানভয়ে কসোভো থেকে পালিয়ে যায় ২ লক্ষ ২৫ হাজার নাগরিক।

বসনিয়া সংঘটিত Sebrenica Massacre শুরু হয়যখন বসনিয়া-হারজেগোবিনা ১৯৯২ স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং সার্ব নেতা স্লোভেদান মিলোসেভিসের নির্দেশে হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট, অগ্নি সংযোগ সহ এমন কোন অপরাধ নেই যা বসনিয়া ক্রোয়েশিয়ার সার্বরা করেনি। বলকান অঞ্চলের কসাই নামে অভিহিত স্লোভেদান মিলোসেভিস যতগুলো গণহত্যার জন্ম দিয়েছিলেন তার মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য ও লোমহর্ষক ঘটনা হচ্ছে ১৯৯৫ সালের সেব্রেনিসার গণহত্যা যদিও সারায়েভো তুজলাও জেপা শহরকে জাতিসংঘ কর্তৃক নিরাপদ শহর বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। তথাপিও জাতিসংঘ এর সকল নিরাপত্তা বেষ্টনি ১৯৯৫ সালে সেব্রেনিসায় গণহত্যা চালায় এবং নির্মম মুসলিম নিধনযজ্ঞ শুরু করে। এতে প্রায় ৪২ হাজার মুসলিম নরনারীকে হত্যা করে এই সার্ব বাহিনী।তথা Ethnic Cleansing এর মত একটি জগন্য ঘটনা কসোভোতে ও পরিলক্ষিত হয়। ১৯৯৯ সালের পর থেকে কসোভো শুধু কাগজে কলমে

সার্বিয়ার অধীনে ছিল। কারণ ১৯৯৯ সাল থেকে ন্যাটোর ১৬ হাজার ও জাতিসংঘের ২ হাজার সেনা সেখানকার নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। আর দেশটি পরিচালিত হয়ে আসছিল জাতিসংঘের ১২৪৪ নং প্রস্তাবের অধীনে।

কসোভোর স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ১৯৬৪ সালে যোসেফ ব্রোজ মার্শাল টিটোর নেতৃত্বে ছয়টি স্বায়ত্বশাসিত প্রজাতন্ত্র এবং কসোভো ও ভাইভোদিনা এ দু'টো স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল নিয়ে যুগোস্লাভিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। এ দেশটিতে রুশ প্রভাবিত সমাজতান্ত্রিক শাসন কায়েম থাকলে ও মার্শাল টিটোর গতিশীল নেতৃত্ব দেশটিকে উন্নত করে তুলেছিল। ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে টিটো সমন্বিত যৌথ শাসন ব্যবস্থা চালু করেন এবং রাষ্ট্রীয় সংগঠন ফেডারেল ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করেন। ৪ মে ১৯৮০ সালে মার্শাল টিটোর মৃত্যুর পর যারা ক্ষমতায় আসেন তাদের কেউই ফেডারেশনকে টিকিয়ে রাখার মত নেতা ছিলেন না। শেষ পর্যন্ত ঐক্যের বন্ধন ভাঙ্গতে শুরু করে ১৯৯১ সালে। মূলতঃ সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাওয়ার প্রভাব পড়ে ইউরোপের বলকান অঞ্চলে। স্লোভেনিয়া, মেসিডোনিয়া, ও মন্টিনিগ্রো স্বাধীনতা ঘোষণা করে। কোন রক্তপাত ছাড়াই তারা স্বাধীন হয়ে যায়। জাতিগতভাবে আলাদা হলেও ঐ তিনটি দেশের জনগণ ধর্মীয় পরিচয়ে ছিল গ্রিক অর্থোডক্স খ্রীস্টান। ধারণা করা হয় যে, ধর্মীয় পরিচয় ছিল সংঘাত না হওয়ার অন্যতম কারণ। এর পরে খন্ডিত যুগোস্লাভিয়ায় থাকে কেবল কতৃত্ব প্রতিষ্ঠাকারী সার্বিয়া, ক্রোয়েশিয়া ও বসনিয়া- হারজেগোবিনা। বসনিয়া-হারজেগোবিনা ১৯৯২ স্বাধীনতা ঘোষণা দিলে সার্ব নেতা স্লোভেদান মিলোসেভিসের নির্দেশে হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট, অগ্নি সংযোগ সহ এমন কোন অপরাধ নেই যা বসনিয়া ক্রোয়েশিয়ার সার্বরা করেনি। বলকান অঞ্চলের কসাই নামে অভিহিত স্লোভেদান মিলোসেভিস যতগুলো গণহত্যার জন্ম দিয়েছিলে তার মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য ও লোমহর্ষক ঘটনা হচ্ছে ১৯৯৫ সালের সেব্রেনিসার গণহত্যা যদিও সারায়েভো তুজলাও জেপা শহরকে জাতিসংঘ কর্তৃক নিরাপদ শহর বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। জাতিসংঘ এর সকল নিরাপত্তা বেষ্টনি সত্ত্বেও ১৯৯৫ সালে সেব্রেনিসায় গণহত্যা চালায় এবং নির্মম মুসলিম নিধনযজ্ঞ

শুরু করে। এতে প্রায় ৪২ হাজার মুসলিম নরনারীকে হত্যা করে এই সার্ব বাহিনী। বলকান অঞ্চল থেকে শেষ পর্যন্ত বসনিয়া ও ক্রোয়েশিয়া স্বাধীন হয়। এর পর থাকে কেবল সার্বিয়া। ততদিনে সার্বিয়ার একপ্রান্তে ছোট্ট এলাকা কসোভোর মানুষের মধ্যে স্বাধীনতা স্বপ্ন জেগে উঠে। সার্ব নেতাদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে ১৯৯৮ সালে কসোভো স্বাধীনতার দাবি করে। বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী হাশিম থাচির নেতৃত্বে গড়ে উঠে কসোভো লিবারেশন আর্মি KLA (১৯৯৬)। এদিকে সার্ব সেনাবাহিনী কসোভোয়ে হত্যাযজ্ঞ শুরু করলে KLAশুরু করে প্রতিরোধ যুদ্ধ। তাদের দাবি স্বায়ত্বশাসন নয় স্বাধীনতা। নির্মম সার্ব আক্রমনে KLA প্রথমে পাহাড়ে পালিয়ে গিয়ে পাল্টা আক্রমন করে। সার্ব বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতি বাড়াতে থাকলে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন শান্তির উদ্যোগ নেয়। এক বছরে সার্ব বাহিনীর হাতে প্রায় ১০ হাজার মানুষ নিহত হয়। ধ্বংস হয়ে পড়ে সরকারী বেসরকারী ভবন, পরিবহন যোগাযোগ সেতু, চমৎকার কারুকাজ সমৃদ্ধ পুরনো আমলের মসজিদ সহ অসংখ্য স্থাপত্য নিদর্শন। আড়াই লাখ লোক ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

১৯৯৮ সাল থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত সারা বছর জুড়ে সার্বিয়ার সৈন্যবাহিনী নিরীহ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার উপরে নিষ্পেষনের যে স্টীম রোলার চালিয়ে যায় তার জ্বলন্ত উদাহরণ হলো Racak Massacre। সার্বিয়ার দুর্ধর্ষ সৈন্যবাহিনী ১৫ জানুয়ারী ১৯৯৯ সালে কসোভোর অভ্যন্তরে রাকাক নামক একটি জনপদকে জনশূণ্য করে দেয়। এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে, আমেরিকার রাষ্টদূত উইলিয়াম ওয়াকার (William Walker) রাকাক এলাকা পরিদর্শন করতে গিয়ে এর বীভৎতা দেখে বাকশূণ্য হয়ে গিয়েছিলেন এবং Ethnic Cleansing Policy -এর একটিঘৃণ্যতম উদাহরণ স্বরূপ আখ্যায়িত করেন। জাতিসংঘ এবং ইউরোপীয় কমিশনের যৌথ তত্ত্বাবধানে বলকান সমস্যা সমাধানের দুইজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন Cyrus Vance এবং Lord Owen । উভয়ে মেলোসেভিসের বর্বরতাকে স্বাক্ষর হিসাবে সার্বীয় Concentration Camps এর খোঁজ পান যেগুলো দ্বারা Ethnic Cleansing Policy

কার্যকরী করা হতো।[৪] *Foreign Affairs Journal* এই Racak Massacre সম্বন্ধে উল্লেখ করে যে, “The Massacre was the turning point of the war”.[৫] Racak Massacreসম্পর্কে আরো উল্লেখ করা হয়-

> The Racak Massacre in January 1999 in particular brought new international attention to the conflict. Within a few days, a Multilateral international conference was convened and by March had prepared a draft agreement known as the Rambouillet Accords calling for restoration of Kosovo's autonomy and deployment of NATO peacekeeping forces. The Serbian party found the terms unacceptable and refused to sign the draft.[৬]

জাতিসংঘ প্রতিনিধি রিচার্ড হলব্রুক (Richard Holbrooke) তাৎক্ষনিক ভাবে ১৫ ই জুন ১৯৯৯ সালে রাকাক সহ অন্যান্য জনপথ অঞ্চলে যেখানে Ethnic Cleansing সংঘটিত হয়েছে সেই সকল স্থান পরিদর্শন করার পর স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেন যে, সাধারণ জনগনের উপর এই ধরনের বর্বর ও নিষ্পেষনের ঘটনা ইতিহাসে বিরল।

২০০৬ সালে কসোভোর ভাগ্য নির্ধারণের জন্য আন্তর্জাতিক আলোচনা শুরু হয়। ইসলামী ধর্মাবলম্বী তুর্কীদের সাথে খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী ইউরোপীয় স্লাভ জাতিগুলোর ধর্ম ও বর্ণের পার্থক্য ছিল। ফলে তাদের মধ্যে কোন ঐক্য গড়ে উঠেনি। ইউরোপ থেকে তুরস্কের বিতাড়িত হওয়ার ক্ষেত্রে শুধু বলকান জাতীয়তাবাদী আন্দোলন নয় বরং এর পেছনে প্যান-স্লাভ আন্দোলনেরও একটি ভূমিকা রয়েছে। এই আন্দোলনের মাধ্যমে বলকান জাতীয়তাবাদও তীব্র হয়ে উঠে। উত্তর ও দক্ষিন স্লাভগোষ্ঠীকে একত্রিত করা এবং বলকানের অন্যত্র ছড়িয়ে থাকা স্লাভদের

ঐক্যবদ্ধ করাই ছিল এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর (১৯৩৯-১৯৪৫ সাল) জোসেফ ব্রোজ টিটোর (১৮৯২-১৯৮০) নেতৃত্বে ছয়টি প্রজাতন্ত্রের জনগণ তাদের স্ব স্ব জাতিসত্তার চেতনায় উজ্জীবিত হতে থাকে। সাবেক সোভিয়েত[৭] ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে সমাজতন্ত্রের পতনের সাথে সাথে যুগোস্লাভিয়ার সমাজতন্ত্রের ভীত নড়বড়ে হয়ে উঠে। প্রথম সুযোগেই ফ্রাঞ্জো তুজমান (মৃত্যু ১৯৯৯ সাল) এর নেতৃত্বে ক্রোয়েশিয়া ১৯৯১ সালের ২৫জুন স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং পশ্চিমা বিশ্বের স্বীকৃতি লাভ করে। এরপর মেসিডোনিয়া স্বাধীনতা ঘোষনা করেও পাশ্চাত্যের স্বীকৃতি পায়নি। সার্বিয়া যুগোস্লাভফেডারেশনকে টিকিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। উল্লেখ্য যে, কমিউনিষ্ট শাসনামলে ফেডারেশনে সকল জাতিগোষ্ঠির সমান অধিকারের কথা থাকলেও সরকারের প্রশাসন ও সামরিক বাহিনীতে সার্বদের প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি বজায় ছিল। সার্বদের প্রাধান্যকে কেন্দ্র করেই যুগোস্লাভিয়ার নামকরন এবং ১৯২৯ সালে আলেকজান্ডার সর্বময় ক্ষমতা গ্রহণ করে।

স্লোভেদান মিলোসেভিচ যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর কসোভো যে সামান্য স্বায়ত্তশাসন ভোগ করতো সেটিও সংকুচিত হয়ে যায়। স্যামুয়েল পি. হান্টিংটন যথার্থই উল্লেখ করেছেন "In Kosovo, Albanian Muslims unhappily suffer [ed] Serbian rule and maintain their own.........parallel government, ..." শিক্ষা ক্ষেত্রেও তাদের অধিকার হরণ করা হয়। পূর্বে কসোভো পুলিশের নিয়ন্ত্রণ কসোভোর কাছেই ছিল। ১৯৮৯ সালে মিলোসেভিচ সেটিও প্রত্যাহার করে নেয়। *Muslim Identity* উল্লেখ করা হয়েছে, "In 1994, for example, some 19000 cases of police harassment of Albanians were reported by the Council for the Defence of Human Rights and Freedom based in Pristina"[৮] এ পরিবেশে ১৯৯৬ সালে কসোভো লিবারেশন আর্মি (KLA) নামক সংগঠনটির গঠন করা হয়। এবার তাদের দাবি স্বায়ত্ত্বা শাসন নয় স্বাধীনতা। KLA এর মাধ্যমে কসোভোর জনগণ তাদের

স্বাধীনতা লাভের স্বপ্ন বুনতে থাকে এবং এক পর্যায়ে তারা স্বাধীনতা দাবি করে। সাথে সাথেই শুরু হয় সার্ব বাহিনীর অত্যাচারের স্টীমরোলার। সার্ব বাহিনীর নির্মম আক্রমণের ফলে প্রথমে পাহাড়ে পালিয়ে গিয়ে পাল্টা আক্রমনে সার্ব বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতি বাড়তে থাকলে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন শান্তির উদ্যোগ নেয়। সাতমাসের সংঘর্ষের ফলে মৃতের সংখ্যা হাজার পৌছে। আড়াই লাখ লোক ঘরবাড়ি ছেড়ে পালায়।[৯] সাপ্তাহিক *দি ইকনমিষ্ট* স্বীকার করেছে যে, কসোভোর ব্যাপারে পাশ্চাত্যের প্রতিক্রিয়া ছিল সম্বুকগতি সম্পন্ন। কসোভো গৃহ যুদ্ধের ব্যাপারে একটা সাময়িক সমাধান হয়েছে (অক্টোবর, ১৯৯৮)। মার্কিন মধ্যস্থতাকারী ও প্রেসিডেন্ট বিলক্লিনটনের বিশেষ দূত ছিলেন ট্রাবেল শূটার রিচার্ড হলব্রুক। তার প্রচেষ্টায় এই সমাধানটি পাওয়া যায়।

যুগোস্লাভিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট স্লোভেদান মিলোসেভিস এমন একটা সময়ে রিচার্ড হলব্রুকের সাথে সমঝোতায় উপনীত হয়েছিলেন যখন কসোভোতে সার্বীয় অবস্থানের উপর ন্যাটোর বিমান হামলা একরকম অবধারিত ছিল। ন্যাটোর বিমানগুলো প্রস্তুত ছিল বিমান হামলা চালানোর জন্য। শুধু অপেক্ষা ছিল হলব্রুকের কাছ থেকে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত শোনার। কসোভো যুদ্ধের সুপ্রিম কমান্ডার ছিলেন Wesley Kanne Clark, Sr। তিনি ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবসরপ্রাপ্ত সামরিক জেনারেল। তিনি ১৯৯৭ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত ন্যাটো এর দায়িত্বে ছিলেন। ন্যাটো এর বড় অবদান হচ্ছে জাতিগত সমস্যায় জর্জরিত আলবেনিয় মুসলমানদের প্রায় ১.৫ মিলিয়ন লোককে রক্ষা করতে বাস্তব মুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন ১৯৯৯ সালে ন্যাটোকে অনুমতি দেয় সার্বিয়ার গণহত্যার বিরুদ্ধে বোমা হামলার। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

Between March 24 and June 10, 1999, NATO intervened by bombing Yugoslavia aimed to force Milosevic to withdraw his forces from Kosovo. The military action was not authorized by the Security Council of the

> United Nations and was therefore contrary to the provisions of the United Nations Charter.Combined with continued skirmishes between Albanian guerrillas and Yugoslav forces the conflict resulted in a further massive displacement of population in Kosovo. During the conflict, roughly a million ethnic Albanians fled or were forcefully driven from Kosovo. Altogether, more than 11,000 deaths have been reported to Carla Del Ponte by her prosecutors. Some 3,000 people are still mising, of which 2,500 are Albanians', 400 Serbs and 100 Roma.[১০]

মার্কিন সশস্ত্র বাহিনীর ব্যবহার অনুমোদিত ন্যাটো কমান্ডার ওয়েসলি ক্লার্ক বোমা বর্ষণ শুরু করলে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ১২৪৪ নং প্রস্তাব অনুযায়ী ১০ জুন ১৯৯৯ সালে বন্ধ করেন। এবং কসোভো মূলত তখন থেকে এই রেজুলেশন অনুযায়ী চলতে থাকে। এই যুদ্ধের আরেকজন অন্যতম ডেপুটি কমান্ডার ছিলেন জেনারেল স্যার মাইক জ্যাকসন। পরে তিনি ন্যাটো প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৯ সালে সার্ব বাহিনীর হাত থেকে কসোভোকে রক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি তার আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেন কসোভো যুদ্ধে ডেপুটি কমান্ডার হিসেবে কসোভোর হাজার হাজার উদ্বাস্তু লোককে ফিরিয়ে আনতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছিলেন। এবং স্লোভেদান মিলোসেভিচ তার বাহিনী কসোভো থেকে প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি ন্যাটো সুপ্রীম কমান্ডার জেনারেল ওয়েসলি ক্লার্ককে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন যে, "I am not going to start Third World War for you". তিন মাসের প্রচন্ড সহিংসতা ও ন্যাটোর প্রবল চাপের মুখে যুগোস্লাভ প্রেসিডেন্ট মিলোসেভিসকে ১৯৯৮ সালের মে মাসে কসোভোর প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনায় বসতে

468252

হলব্রুক রাজি করিয়েছিলেন সত্য, কিন্তু কসোভো সংকটের পুরো সমাধান হয়েছে তখনও বলা সম্ভব হয়নি। এমনকি রিচার্ড হলব্রুক নিজেও এই সমঝোতার ব্যাপারে নিশ্চিত নন।

রিচার্ড হলব্রুকের সাথে স্লোভেদান মিলোসেভিচের যে সমঝোতা হয়েছে, তাতে কসোভো থেকে সার্বীয় পুলিশ ও নিরাপত্তারক্ষীদের প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। এই মেলোসেভিস ছিলেন একজন উগ্রজাতীয়তাবাদী সার্ব নেতা। বলকান মুসলমানদের প্রতি তার বিরূপনীতি ও নৃশংস কর্মকান্ডের জন্য ইতিহাসে তিনি 'Balkan butcher'হিসেবে পরিচিত।

কসোভো গৃহযুদ্ধের ব্যাপারে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের বিশেষ দূত ছিলেন ট্রাবেল শ্যূটার রিচার্ড হলব্রুক। তিন মাসের প্রচন্ড সহিংসতা ও ন্যাটোর প্রবল চাপের পর যুগোস্লাভ প্রেসিডেন্ট মিলোসেভিচ ১৯৯৮ সালের মে মাসে কসোভোর প্রতিনিধির সাথে আলোচনায় বসতে রাজী হন[১১]। কসোভোর প্রতিনিধি ইব্রাহিম রুগোভা দুবার স্বঘোষিত কসোভো প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন। সন্ত্রাস বিরোধী থাকায় তাকেই ন্যাটো প্রতিনিধি হিসেবে ডাকে। কসোভোর পনের সদস্যের প্রতিনিধির সাথে দীর্ঘ আলোচনা এবং কসোভো যুদ্ধ এ দু'ধারা এক সঙ্গেই চলতে থাকে।[১২] এ সময় কসোভোর অভ্যন্তরীন রাজনীতিতে ইব্রাহিম রুগোভোর কসোভো ডেমোক্রেটিক লীগের জনপ্রিয়তা কমে যায়। তার অনেক সদস্য যোগ দেন KLAতে। KLA ইব্রাহিম রুগোভোর নেতৃত্ব অস্বীকার করে। জুলাই মাসে KLA এর বিদেশ বিষয়ক মুখপাত্র বদরুল মাহমুদ ঘোষনা করেন যে, কসোভোর জাতীয় আন্দোলন হচ্ছে KLA রাজনৈতিক শাখা। তিনি আরও দাবি করেন, যুগোস্লাভিয়া কসোভো থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করলেই শুধু যুদ্ধ বিরতি সম্ভব।[১৩] বসনিয়াতে যা ঘটেছিল কসোভোতে তারই প্রতিফলন ঘটে। হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ হয়ে উঠে প্রতিদিনের নৈমিত্তিক ঘটনা। প্রাণভয়ে কসোভোতে পালিয়ে যায় ২ লক্ষ ২৫ হাজার নাগরিক। ১৯৯৮ সালের ৯ মার্চ যুক্তরাষ্ট্র ও ৫টি ইউরোপীয় দেশ ঘোষণা করে যে, তারা যুগোস্লাভিয়ার উপর অবরোধ আরোপ করবে যদি তারা কসোভোর উপর এ সহিংস আক্রমণ বন্ধ না করে।[১৪]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

৯০ এর দশকে কসোভো স্বাধীনতা ঘোষণা না দিলেও সেখানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে। এরপর যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ নির্দেশে জাতিসংঘে '১২৪৪' নম্বর প্রস্তাব পাশ হয় এবং এই প্রস্তাব অনুসারে কসোভো তখন থেকেই জাতিসংঘের নিয়ন্ত্রনে সার্বিয়ার একটি প্রদেশ হিসেবে পরিচিত হয়ে আসছিল। প্রস্তাবে আরো বলা হয় যে, খুব শীঘ্রই কসোভো জাতিসংঘের প্রশাসনের অধীনে ১৬ হাজার ন্যাটো এবং এক হাজার আটশত ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যদের তত্ত্বাবধানে ২০০৮ সালের মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত চলবে। ২০০৬ সালের ১১ মার্চ মিলোসোভিচ মৃত্যুবরণ করলে ২০০৭ সালের ২ এপ্রিল জাতিসংঘ কসোভোকে পৃথকীকরণের বিষয়ে আলোচনা শুরুকরে। যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিকোলাস বার্নস ২০০৭ সালে জাতিসংঘের বিশেষ দূত মার্টি আইতিসারির প্রস্তাব অনুযায়ী কসোভোর স্বাধীনতার প্রতি সমর্থন ঘোষণা করেন।

রাশিয়া ও সার্বিয়া শুরু থেকেই কসোভোর স্বাধীনতা বিরোধী ছিল। ২০০৭ সালের ১৯ মার্চ রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছিল, কসোভোর স্বাধীনতা ইউরোপের শান্তি ও স্থিতিশীলতাকে ব্যাপকভাবে বিনষ্ঠ করবে। অপর দিকে ২০০৭ সালের ৩ এপ্রিল জাতিসংঘের প্রদত্ত ভাষণে সার্বিয়া সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করলে কসোভোর নেতারা স্বাধীনতার ঘোষণা পিছিয়ে দেয়। অবশেষে সেখানে জাতিসংঘ কর্তৃক একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৭ নভেম্বর, ২০০৭ সালে। Kosovo National Assemblyতে মোট আসন ১২০টি। এর মধ্যে সংরক্ষিত দশটি সার্বদের জন্য এবং দশটি সংখ্যালঘিষ্টদের জন্য। হাসিম থাচির দল 'Democratic Party of Kosovo'৩৪.৩% ভোট নিয়ে মোট ৩৭ টি আসন লাভ করে অন্যদিকে আজিম শেকুরের নেতৃত্বে ২২.৬% ভোট পেয়ে ২৫ টি আসন পায় 'Democratic League of Kosovo'। হাশিম থাচির দল বিজয়ী হলেও সংখ্যা গরিষ্ঠতা না পেয়ে আজিম শেকুরের সাথে কোয়ালিশন সরকার গঠন করে প্রধানমন্ত্রী হন হাশিম থাচি এবং প্রেসিডেন্ট হন ফেতমির সেজদিও। তাঁরা একত্রে মিলে দেশটির স্বাধীনতা ঘোষণায় সচেষ্ট হয়। কসোভোর পার্লামেন্টের বিশেষ অধিবেশনে কসোভোর সাংসদরা স্বাধীনতার পক্ষে ভোট দেন। কসোভোর

পার্লামেন্ট সর্বসম্মত ক্রমে স্বাধীনতা ঘোষনা অনুমোদন করলে ১৭ ফেব্রুয়ারী ২০০৮ সালের বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে আটটায় প্রধানমন্ত্রী হাশিম থাচি পার্লামেন্টে কসোভোর স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র পড়ে শোনান।

ঐতিহাসিক ঘোষণায় বলা হয় যে, কসোভো হবে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং সংখালঘু সার্বদের সকল অধিকার নিশ্চিত করা হবে। কসোভোর প্রেসিডেন্ট ফাতমির সেজদিও বিশ্বের সকল দেশের প্রতি তার দেশের স্বীকৃতি দেওয়ার আহবান জানিয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ্য যে ২ জুলাই ১৯৯০ সালে আরো একবার কসোভোর স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল। তবে এই সময় কসোভোর পার্লামেন্টের দেয়া স্বাধীনতার ঘোষনা কে কেবল আলবেনিয়া স্বীকৃতি দিয়েছিল। কসোভো সার্বিয়ার সঙ্গে কোন রকম চুক্তি বা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অনুমতি না নিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করায় কিছুটা বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে বৃটেন, ফ্রান্স,জার্মানি ও ইটালি স্বীকৃতি দেয়। রাশিয়ার নেতৃত্বে গ্রিস, স্পেন, স্লোভেনিয়া ও বুলগেরিয়া সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত কসোভোর স্বীকৃতি প্রদানে বিরত থাকে।[১৫] ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতাদের মধ্যেও মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ বলেছেন ইতিহাস একদিন প্রমাণ করবে কসোভোর স্বাধীনতা ন্যায় সঙ্গত।[১৬] কসোভোর স্বাধীনতার প্রশ্নে রাশিয়া তীব্র বিরোধীতা করেছিল। রাশিয়া মনে করে কসোভোর স্বাধীনতা বিশ্বজুড়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন উস্কে দেবে।[১৭] সার্বিয়া ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্র থেকে তাদের ডিপ্লোম্যাটদের সরিয়ে নেন এবং তাদের এক মন্ত্রী বলেন যতদিন সার্বিয়া টিকে থাকবে, ততদিন কসোভোকে সার্বিয়ার অধীনেই থাকতে হবে। কসোভোর স্বাধীনতা নিয়ে রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র পরস্পর মুখোমুখি হয় এবং স্বীকৃতি দাতা দেশগুলো সার্বিয়া থেকে তাদের রাষ্ট্রদূত প্রত্যাহার করে নেয়।[১৮]

কসোভোর ব্যাপারে ছয় জাতি কন্ট্রাক্ট গ্রুপ গঠন করা হয় যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য, জার্মানী, ফ্রান্স ও ইতালী দেশ গুলোকে নিয়ে। ১৯৯৮ সালের জুলাই মাসে জার্মানীর রাজধানী বন

নগরীতে কন্ট্রাক্ট গ্রুপের এক বৈঠকে এরা কসোভো শান্তির রূপরেখা নির্ধারণ করে। তারা স্বাধীনতার দাবিকে প্রত্যাখ্যান করে কসোভোর জন্য স্বায়ত্ত্বশাসনের ব্যবস্থা রাখে এবং বলে যে, শান্তি পর্যবেক্ষণের জন্য কসোভোর বিদেশী পর্যবেক্ষক পাঠানো হবে। অনেক বাদানুবাদের পর ১৯৯৮ সালের ১২ অক্টোবর একটি যুদ্ধ বিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এতে বলা হয় যুগোস্লাভিয়াকসোভো থেকে সৈন্য ও পুলিশ প্রত্যাহার করবে। নয় মাসের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। রাষ্ট্র বিরোধী কাজের জন্য ক্ষমতা ঘোষণা, যুদ্ধাপরাধীদের আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে হস্তান্তর ও বিচার কাজে সহায়তা দান, কসোভোতে আলবেনীয়দের অনুপাতে আঞ্চলিক পুলিশ বাহিনী, সংসদ ও বিচার ব্যবস্থা গড়া এবং স্থলে ও আকাশে আঞ্চলিক পর্যবেক্ষণ বাঁধা না দেয়া। কসোভোতে শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণের জন্য ২০০০ পর্যবেক্ষক প্রেরণ ব্যবস্থা রাখা হয়।ন্যাটো এবং ইউরোপীয় কমিশনের বারংবার সতর্কবানী উপেক্ষা করে সার্ব বাহিনী কসোভোর পাদোয়েভো শহরের KLA ঘাঁটিতে আক্রমণ চালায়। এ প্রসঙ্গে Europa World Year Book এর বক্তব্য প্রনিধানযোগ্য "In early January 1999 further clashes between Serbian and KLA forces were reported" যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ বিরতি লংঘনের ও KLAএর অপহরণ কাজের তীব্র নিন্দা করে। ফ্রান্সের রামবুলিতে পুনরায় শান্তি আলোচনা শুরু হয়। এতো কিছুর পরও ন্যাটো সার্বিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রস্তুতি নেয়।

১৯৯৯ সালের ২৪শে মার্চ ন্যাটো বিশেষ করে বেলগ্রেড নভি সাদ প্রিষ্টিনা ও পোড়গোরিয়াতে ক্ষেপনাস্ত্র ও বিমান হামলার মাধ্যমে শক্তি প্রয়োগ করে।২০০৫ সালের ১৪ই মার্চ বিচারাধীন থাকাকালে স্লোভেদান মিলোসেভিচ নেজ কারা কক্ষে ১১ মার্চ ২০০৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন। ২০০৭ সালের ২রা এপ্রিল জাতিসংঘ কসোভোকে পৃথকীকরণের বিষয়ে আলোচনা শুরুহয়। যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিকোলাস বার্নস ২০০৭ সালে জাতিসংঘের বিশেষ দূত মার্টি আহতিসারির প্রস্তাব অনুযায়ী কসোভোর স্বাধীনতার প্রতি সমর্থন ঘোষণা করেন। রাশিয়া ও সার্বিয়া শুরু থেকেই কসোভোর স্বাধীনতা বিরোধী। ২০০৭ সালের ১৯ মার্চ রাশিয়ার

পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের পর্যবেক্ষণ হল, কসোভোর স্বাধীনতা ইউরোপের শান্তি ও স্থিতিশীলতাকে ব্যাপকভাবে বিনষ্ট করবে। অপরদিক ২০০৭ সালের ৩ এপ্রিল জাতিসংঘ প্রদত্ত ভাষণে সার্বিয়া সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করে ছিল। নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার ফলে কসোভোর নেতারা স্বাধীনতার ঘোষণা পিছিয়ে দেন। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আশংকা ছিল, তখন স্বাধীনতা ঘোষণা করলে সার্বিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন উগ্রজাতীয়তাবাদী প্রার্থী তোমিস্লাভ নিকোলিস এর সমর্থন বেড়ে যেতে পারে। অবশেষে ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ সালে কসোভোর পার্লামেন্ট স্বাধীনতার ঘোষণা অনুমোদন করে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে কসোভোর যে স্বাধীনতার ঘোষণা ১৮ বছর আগেও একবার দেয়া হয়েছিল ১৯৯০ সালের ২ জুলাই এই সময় কসোভোর পার্লামেন্টে দেয়া স্বাধীনতার ঘোষণাকে কেবল আলবেনিয়া স্বীকৃতি দিয়েছিল। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাড়া না পাওয়ার কারণে স্বাধীনতার ঘোষণা এবং ঘোষণার আলোকে প্রস্তুতকৃত কনষ্টিটিশন অবদি রিপাবলিক অব কসোভো কোনটিই কাজে আসেনি। এই স্বাধীনতার ঘোষনার ফলে সার্বিয়া ও ক্রোয়েশিয়া থেকে বিতাড়িত সার্বদের কসোভো জুড়ে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে সার্ব সরকার। ফলে অধিকতর যাতনা ও নির্যাতনের শিকার হয় কসোভোবাসী। কসোভো লিবারেশন আর্মির নেতৃত্বে শুরু হয় স্বাধীনতার সংগ্রাম। অনুকূল আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তারা এবার সফল হয়। ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ আনুষ্ঠানিকভাবে কসোভো পার্লামেন্ট জরুরী বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে সার্বিয়ার কাছ থেকে স্বাধীনতার এই ঐতিহাসিক ঘোষণা অনুমোদিত হয়। বাংলাদেশ সময় রাত ৮.৩০ মিঃ প্রধানমন্ত্রী হাশিম থাচি পার্লামেন্টে কসোভো স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র পাঠ করেন।[১৯]

বিভিন্ন শক্তিবর্গের ভূমিকা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা ঃ কসোভোর স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘটনা প্রবাহকে ত্বরান্বিত করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বসনিয়ার স্বাধীনতা যুদ্ধের মত, যুক্তরাষ্ট্র কসোভো স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের পক্ষাবলম্বন করে। আধুনিক বিশ্বের ইতিহাসে এই পদক্ষেপ ছিল সাড়া জাগানো ও গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে প্রখ্যাত গবেষক ও লেখক স্যামুয়েল পি. হান্টিংটন এর উক্তি তাৎপর্যপূর্ণ:

> The Question thus is: Why during and after the war was the United States the only country to break the Civilizational mould and become the single non-Muslim Country promoting the interest of the Bosnian [Kosovo] Muslims and working with Muslim Countries on their behalf ? What explains this American anomaly?[২০]

যুক্তরাষ্ট্রের এই অভিনব নীতির ব্যাখ্যায় গবেষক ও বিশেষজ্ঞদের মত হল যে, বসনিয়া ও কসোভোর পক্ষগ্রহণ ছিল মুসলমানদের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের নতুন কূটনৈতিক কৌশল এর বর্হিঃপ্রকাশ। তারা বলকান অঞ্চলের মৌলবাদ ইসলামের অভ্যুদয় ঠেকাতে স্বাধীনতাকামী মুসলিমদের পক্ষ নেয়। কূটনীতির ভাষায় যাকে বলা হয়, "Relationsrooted in convergences of interests unrelated to those States"

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই অভিমত পোষণ করে যে কসোভোকে স্বীকৃতি প্রদান করে বিশ্বেরদ্বিতীয় বৃহতম মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের বাকী আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগ দেয়ানৈতিক দায়িত্ব। ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসের মুখপাত্র স্পষ্টভাবে বলেন, কসোভোর সাফল্য যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একটি বড় অগ্রাধিকার। শান্তিপূর্ণ, বহুধর্মের মিলন স্থল, গণতান্ত্রিক ও স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে এ রাষ্ট্রের পূর্ণ বিকাশ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। মুখপাত্র আরো

বলেন, কারণ এ রাষ্ট্র হচ্ছে বলকান অঞ্চলে দীর্ঘস্থায়ী স্থিতিশীলতা আনতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দীর্ঘ প্রচেষ্টার অংশ। তিনি বলেন বিশ্বের ৬০টিরও বেশি দেশ কসোভোকে স্বীকৃতি দিয়েছে যার মধ্যে সৌদি আরবসহ ওআইসির কমপক্ষে ১০টি দেশ রয়েছে। তাছাড়া কসোভো বিশ্ব ব্যাংক ও আইএমএফ এর সদস্যপদ লাভ করতে সক্ষম হয়।

রাশিয়ার ভূমিকাঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উত্তর পরিস্থিতিতে বিশ্বে দুই পরাশক্তির উদয় ঘটে যথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়া। ১৯৪৫ সাল থেকেই এই দুই Super Power এর মধ্যে যে চরম দ্বন্দ্বদৃশ্যমান হয় ইতিহাসে যা শীতল বা স্নায়ুযুদ্ধ বা Cold War হিসেবে সুপরিচিত। স্নায়ুযুদ্ধকালীন সময়ে রাশিয়ার মুসলিম বিদ্বেষ পূর্ণভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠে। বিশেষ করে বলকান ও মধ্য এশিয়ায় সোভিয়েত রাশিয়া "Anti –Muslim Role" এর জন্য সর্বজনবিদিত হয়ে উঠে। প্রথমে বসনিয়া যুদ্ধে ও পরবর্তীতে কসোভোর যুদ্ধে রাশিয়া "OPENLY"মুসলিমদের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। বলকান অঞ্চলে স্লাভ জাতির সাথে নৃ-তাত্ত্বিক সম্পর্ক থাকায় সার্বিয়া এ যুদ্ধ বিগ্রহে রাশিয়ার স্মরণাপন্ন হয়। স্বভাবতই রাশিয়া ''Men, Materil ও Resources" দিয়ে সার্বিয়াকে প্রথমে বসনিয়া ও পরবতীর্তে কসোভোর স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। এমনকি সার্বিয়া কর্তৃক গৃহীত মানবাধিকার বিরোধী 'Ethnic Cleansing Policy' এর বাস্তবায়নে রাশিয়া সরাসরি সার্বিয়াকে সহায়তা প্রদান করে। এর মধ্যে স্রেব্রেনিসা গণহত্যায় রাশিয়ার সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। স্যামুয়েল পি. হান্টিংটন যথার্থই মন্তব্য করেছেন:

> The Yugoslav wars…produced a virtually unanimous rallying of the Orthodox World behing Serbia. Russian Nationalists, military officers, para militias and Orthodox Church leaders were outspoken in their support for Serbia… Russian and Serbian Nationalist

> worked together arousing opposition in both Countries to the Western New World Order. In considerable measure these sentiments were shared by the Russian Populace with over 60 percent of Muslims… opening NATO air strikes in ….1995.[২১]

গবেষকদের মতে কসোভো স্বাধীনতা সংগ্রামের রাশিয়ার মুসলিম বিরোধীতার ভিত্তি ছিল "The Cause of Slavic brotherhood" এবং এ নীতির প্রতি তার পূর্ণ সমর্থন ও বর্হিঃপ্রকাশ।

সৌদি আরবের ভূমিকাঃ বর্তমান বিশ্ব মুসলিমের পবিত্রতম জায়গা ও পূণ্যভূমি, হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর আগমনে ধণ্য তীর্থস্থান মক্কা ও মদীনার দেশ সৌদি আরবের ভূমিকা ছিল উল্লেখ করার মত। সৌদি আরব ২০০৯ সালের ২০ এপ্রিল কসোভো প্রজাতন্ত্রকে স্বীকৃতি দেয়ার কথা ঘোষণা করেন। কসোভোর জনগণের সাথে সাংস্কৃতিক বন্ধন এবং কসোভোর জনগণের স্বাধীনতা অর্জনের ইচ্ছার প্রতি সম্মান প্রদান করা হয়েছে। সৌদি আরব আশা করে এই স্বীকৃতির ঘটনা কসোভো ও পাশ্ববর্তী দেশগুলোতে স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তার ভিত্তি জোরদার ইতিবাচক অবদান রাখবে।[২০] সৌদি আরব ২০ এপ্রিল কসোভোকে স্বীকৃতি দেয়। ৭ই আগষ্ট দু'দেশে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে। কসোভো সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে দূতাবাস স্থাপন করেছে এবং সৌদি আরব ও কসোভোর রাজধানী প্রিষ্টিনায় লিয়াজো অফিস স্থাপন করেছে।

তথ্য নির্দেশ ও টীকা

১। একই সময়ে Vojvodina নামক অন্য স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চলটিকে ও মিলোসেভিস গ্রাস করে সরাসরি সার্বিয়ার দখলে নিয়ে আসে।

২। মোহাম্মদ তৌফিকুল হায়দার, মাহমুদুর রহমান, 'বলকান মুসলমানদের প্রতি শ্লোভেদান মেলোসেভিসের নীতি: ইতিহাসের নিরিখে বিশ্লেষণ', *সামাজিক বিজ্ঞান পত্রিকা* (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ, পার্ট ডি), খন্ড ৩, সংখ্যা ৩, পৌষ ১৪১৪/ডিসেম্বর ২০০৭ ও পৌষ ১৪১৫/ডিসেম্বর ২০০৮।

৩। *Keesing's Record of World Events,* 1996, p. 40909.

৪। *Mediterranean Quarterly*, Vol-15 No. 4, Fall, 1999, pp. 40-45.

৫। *Foreign Affairs Journal*, Vol-26, January 2000, p.28.

৬। *The Dhaka University Studies*, Vol.67, No. 1, June 2010, p. 5.

৭। সাবেক রাশিয়ার সরকারি নাম ইউনিয়ন অব সোভিয়েত সোস্যালিষ্ট রিপাবলিকস রাখা হয় ১৯২৩ সালে। ১৯১৮ সালের পরের বছর গুলোতে ইউরোপীয় রাজনীতিতে এই দেশটিকেও উপদ্রবকারী শক্তি হিসেবে গণ্য করতে হবে, তবে একেবারে ভিন্ন কারণে। দেশটির গৃহবিবাদ, সোভিয়েত বিরোধীশক্তি বৃটিশ, ফরাসি ও জাপানি সমর্থন লাভ করে এবং মার্কিন সরকার সমর্থন যোগায়। সোভিয়েত সরকার ও মিত্র সরকারগুলির মধ্যে অনেক বছর যে সম্পর্ক চলতে থাকে তা শত্রুতা ও অবিশ্বাসের। এই শত্রুতা ছিলো স্বাভাবিক এবং অনিবার্য। রিফরমেশনের পর থেকে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি নিজেদের এবং একে অপরকে সম্পূর্ণ ও স্বাধীন জাতীয় সত্ত্বা হিসেবে গণ্য করে। অপর দেশের নাগরিকদের মধ্যে শত্রু তৈরি সেই দেশের নাগরিকদের মধ্যে শত্রুতৈরি সেই দেশের নিরাপত্তা দুর্বল করা যুদ্ধের সময় ন্যায়সংগত বিবেচিত হতে পারে, কিন্তু স্বাভাবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মোটেই খাটেনা। সোভিয়েত তত্ত জোরের সঙ্গে এই মৌলিক নীতি বাতিল করে দেয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজেকে জাতীয় সত্ত্বা হিসাবেই স্বীকার করে। তার কাছে রাষ্ট্র হলো রাজনৈতিক সংগঠনের ক্ষণস্থায়ী রূপ যার সঙ্গে আদর্শ বাস্তবায়নের ধারণা মেলে না।

৮। Poulton, Hugh, *Muslim Identity and the Balkan State*, Hurst & Company. London, 1997, p. 159.

৯। আহমেদ, সোহরাব উদ্দীন, *মুসলিম জাহান*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পৃ. ৬৬৯।

১০। *The Dhaka University Studies*, Vol.67, No. 1,p. 5.

১১। *The Economist*, 9 May, 1998.

১২। আহমেদ, সোহরাব উদ্দীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭০।

১৩। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭০।

১৪। *The World Almanac and Book of Facts*, 2006, p. 51

১৫। Kosovo declared independence from Serbia; Russia protested warning it will stir conflict; Charleston *Daily Mail*, 17 February, 2008.

১৬। *দৈনিক যায়যায় দিন*, ২০ ফেব্রুয়ারী, ২০০৮।

১৭। *দৈনিক যুগান্তর*, ২০ ফেব্রুয়ারী, ২০০৮।

১৮। *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ২০ ফেব্রুয়ারী, ২০০৮।

১৯। *প্রাগুক্ত*, ২ মার্চ, ২০০৮।

২০। Samuel P. Huntington,*The Clash of Civilization and the Remaking of World Order,* Simon and Schuster, New York, 1998, p. 289.

২১। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৩।

চতুর্থ অধ্যায়

কসোভো স্বাধীনতা সংগ্রামের সংগঠনের ভূমিকা

প্রতিক্রিয়া আলোচনা-সমালোচনা

কসোভো স্বাধীনতা সংগ্রামের সংগঠনের ভূমিকা

কসোভোর স্বাধীনতা সংগ্রাম বিশ্ব ইতিহাসে তথা আর্ন্তজাতিক পরিমন্ডলে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা করে। নানা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সংগঠিত কসোভোর স্বাধীনতা সংগামে উদ্ভূত পরিস্থিতির সমস্যার সমাধান কল্পে বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক সংগঠন গুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । এগুলোর মধ্যে যেমন জাতিসংঘ, ন্যাটো, ইউরোপীয়ন ইউনিয়ন, ওআইসির মতো বড় বড় সংগঠনগুলোর ভূমিকা আলোচ্য অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা ও বিশ্লেষণ এর প্রচেষ্টা রয়েছে।

জাতিসংঘের ভূমিকাঃ কসোভোর স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে United Nations[১]তথা জাতিসংঘের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ন্যাটো বাহিনীর সহায়তায় মার্কিন মধ্যস্থতাকারী রিচার্ড হলব্রুকের প্রচেষ্টায় আলোচ্য কসোভো সংকট এর একটা সমাধান এ উপনীত হয়।১৯৯০ এর দশকে কসোভো স্বাধীনতার ঘোষণা না দিলেও সেখানে একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে।[২]। যার ফলাফলে আলবেনীয় নেতা ইব্রাহিম রুগোভো রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হন। তখন থেকে কসোভোতে ন্যাটোর ১৬ হাজার সৈন্য মোতায়েন রয়েছে। এর পর সে বছরে যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ নির্দেশে জাতিসংঘে ১২৪৪ নম্বর প্রস্তাব পাশ হয় এবং এই প্রস্তাব অনুসারে কসোভো তখন থেকেই জাতিসংঘের নিয়ন্ত্রণে সার্বিয়ার একটি প্রদেশ হিসেবে পরিচিত হয়ে আসছিল।[৩] এই প্রস্তাবে আরো বলা হয় "For the immediate future Kosovo will be under the control of the UN administrations and 16000 NATO troops. Control will be transition to a 1400 member European Union led mission by mid 2008."[৪] মূলত দশজন ১৯৯৯ সনে UNSC Resolution 1244 এর মধ্যদিয়ে জাতিসংঘের সার্বিক ব্যবস্থপনার অধীনে চলে আসে এবং পূর্ণ স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে যায়। বলা বাহুল্য, জাতিসংগের নিরাপত্তা পরিষদ উক্ত ১২৪৪ সিদ্বান্তকে ভিত্তি করে পরবর্তীতে ১৭ ফেব্রুয়ারী ২০০৮ সনে কসোভোর রাজধানী

প্রিস্টিনায় কসোভো সংসদ থেকে পূর্নাঙ্গ স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়।[৫] এছাড়া ২০০৫ সালে জাতিসংঘ কসোভোর সমস্যা সমাধানের জন্য ফিনল্যান্ডের সাবেক প্রেসিডেন্ট ও জাতিসংঘের বিশেষ দূত মার্টি আহতিশারি কসোভোর মর্যাদা কি হবে তা নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন তৈরি করেন। এতে সুপারিশ করা হয় কসোভো আপাতত স্বাধীন হবে, তবে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তা আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধানে থাকবে। যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ এবং জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের অধিকাংশ সদস্য এই পরিকল্পনার প্রতি সমর্থন প্রদান করেন। জাতিসংঘের ১৯৫টি দেশের মধ্যে কসোভো স্বীকৃতি লাভ করে মোট ৬২টি দেশের। কসোভো যুদ্ধের অবসান প্রসঙ্গে নিম্নে উক্তিটি যথার্থ-

> The war ended on 10 June 1999 with the Serbian and Yugoslav governments signing the Kumanovo agreement which agreed to transfer governance of the province to the United Nations. A NATO-led Kosovo Force (KFOR) entered the province following the Kosovo War, tasked with providing security to the UN Mission in Kosovo (UNMIK).[৬]

NATO এর ভূমিকাঃ NATO[৭] একটি সামরিক সংগঠন। কসোভোর স্বাধীনতার সংগ্রামে আলোচ্য সংগঠনটির ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।NATO এর প্রতিরোধের বিপরীতে মিলোসেভিচের প্রতিরোধ ছিল শান্তি চুক্তি মেনে নেয়া। এই চুক্তি মোতাবেক সার্ব বাহিনী কসোভো থেকে সড়ে আসেবে ও কসোভো স্বায়ত্তশাসন পাবে। ন্যাটো বাহিনী এই চুক্তি তদারকির জন্য কসোভোতে অবস্থান নেবে। NATO এর ২৮টি দেশের মধ্যে কসোভোকে স্বীকৃতি প্রদান করেছে মোট ২৪টি দেশ। কসোভোর স্বাধীনতা সংগ্রামে ন্যাটো বাহিনীর সরাসরি অংশগ্রহণ ছিল একটি অন্যতম ঘটনা। মূলত তাদের সহায়তায়ই কসোভো স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৯৯ সালের জুন মাস থেকে ন্যাটো বাহিনী কসোভোর শান্তি ও নিরাপত্তার দায়িত্বে

থাকে। শেষ পর্যন্ত দেশটির উপর হস্তক্ষেপ করে ন্যাটো ও জাতিসংঘ বাহিনী। ন্যাটো বাহিনী KFOR বা কসোভো ফোর্স গঠন করে এর মাধ্যমে কসোভো স্বাধীনতা সংগ্রামে কসোভোর অধিবাসীদের সহায়তা করে। ন্যাটো সেনারা সার্বদের উপর বিমান হামলা চালালে সার্বরা কসোভো ছেড়ে চলে যায়। NATO ভূক্ত ২৮টি দেশের মধ্যে ২৪টি দেশই কসোভোকে স্বীকৃতি দেয়। এক্ষেত্রে গবেষকদের অভিমত হলঃ

> The role of NATO was also a detrmining factor. NATO backed by the USA has been leading a peace support operation in Kosovo since June 1999 in support of wider international efforts to build peace and stability in the area. Over 14,000 troops from the NATO- led Kosovo Force (KFOR) are still deployed in Kosovo to help maintain a safe and secure environment and freedom of movement forl all citizens, irrespective of their ethnic origin. Following the declaration of independence on 17 February 2008, the Alliance reaffirmed that KFOR shall remain in Kosovo on the basis of UN Security Council Resolution 1244, unless the United Nations Security Council decides otherwise. In June 2008, NATO agreed to take on new tasks in Kosovo to support the develovment of professional, democratic and multi-ethnic security structures.[৮]

ইউরোপীয় ইউনিয়ন এর ভূমিকাঃ কসোভোর স্বাধীনতা সংগ্রামে EU[৯] তথা ইউরোপীয় ইউনিয়নের ভূমিকা ছিল উল্লেখ করার মত। কসোভোর স্বাধীনতার জন্য আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের আনুষ্ঠানিক উদ্যোগের ভিত্তি হলো জাতিসংঘের একটি প্রস্তাবের ব্যাখ্যা, যে প্রস্তাবের কারণে স্লোভেদান মিলোসেভিচের কসোভো আগ্রাসন শেষ হয়েছিল। এই প্রস্তাব অনুযায়ী কসোভোকে জাতিসংঘের তদারকিতে নেয়া হয়। কিন্তু এর সমাধান কিভাবে হবে এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট করে কিছু না বলেই কসোভোর সংকটের একটি রাজনৈতিক সমাধানের

আহ্বান জানানো হয়। আর এ বিষয়ে উভয় সংকটে পড়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের কিছু দেশ। যা তাদের ঐক্যের জন্য একটি পরীক্ষা স্বরূপ। কসোভোর স্বাধীনতা ঘোষণার পরপরই ইউরোপীয় ইউনিয়নভূক্ত দেশগুলোর মধ্যে ১৭টি দেশ স্বীকৃতি দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। এরপর সাইপ্রাস ঘোষণা করে এ বিচ্ছিন্নতা আইনত অবৈধ এবং সার্বিয়ার আঞ্চলিক সার্বভৌমত্বের লঙ্ঘন। ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন (ইইউ) এর ২৭টি দেশের মধ্যে কসোভোকে স্বীকৃতি প্রদান করেছে মোট ২২টি দেশ।

ওআইসির ভূমিকাঃ মুসলিম বিশ্বের ৫৭টি দেশের সমন্বয়ে গঠিত মুসলমান রাষ্ট্রগুলোর সবচেয়ে বড় সংগঠন ও.আই.সি[১০]। কসোভোর স্বাধীনতা ইস্যুতে মুসলিম বিশ্ব বরাবরের মতই নিশ্চুপ ও নির্বিকার। কসোভোর স্বাধীনতার ব্যাপারে ওআইসির ভূমিকা যেরুপ দৃশ্যমান হচ্ছে কাশ্মীর, মিন্দানাও, ফিলিস্তিন, চেচনিয়া ও বসনিয়াতে নির্যাতিত নিপীড়িত মুসলমালদের ব্যাপারে ও সেরুপ ভূমিকা। সুতরাং বিশ্লেষক ও গবেষকদের মতে ওআইসি একটি নামে মাত্র সংগঠন হিসেবেই রয়ে গেছে। ওআইসি কিংবা আরবলীগের মত সংস্থা থাকা সত্ত্বেও তারা মুসলিম দেশগুলোর কোন সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করতে পারছে না। মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে ঐক্য বজায় রাখবে এবং একে অপরের জন্য সহযোগিতা ও সহমর্মিতার হাত বাড়াবে এটাই স্বাভাবিক। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হচ্ছে এই যে, ৫৭টি মুসলিম দেশের সংগঠন ওআইসি ২০০৮ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি স্বাধীনতা ঘোষণার ঠিক পরের দিন তথা ১৮ ফেব্রুয়ারি নতুন স্বাধীন দেশটিকে স্বাগত জানিয়ে সম্মিলিত বিবৃতি দিয়েই তাদের দায়িত্ব শেষ করেছে। ইসলামিক সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি) এর ৫৭ সদস্যের মধ্যে ১৪ সদস্য ইতোমধ্যে কসোভোর স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। এর মধ্যে ইসলামী উম্মাহর শক্তিশালী দেশ ও নেতৃস্থানীয় দেশ সৌদি আরবসহ বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, জর্ডান, মালয়েশিয়া ও তুরস্ক রয়েছে। গত ২০০৯ সালের ২৫মে দামেস্ক ওআইসি পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকে কসোভোর স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে কসোভোর অভ্যূদয়কে স্বাগত জানিয়ে প্রস্তাব পাশ করেছে। তবে সৌদি

আরব কসোভোর স্বীকৃতির প্রস্তাব টেবিলে তুললেও মিশর, ইন্দোনেশিয়া ও সুদানের আপত্তিতে তা পাশ হয়নি।

আরবলীগের ভূমিকাঃ আরবলীগ[১১] হচ্ছে আরবদেশগুলোর সমন্বয়ে গঠিত একটি জোট। এই জোট ২০০৯ সালের মে মাসে আনুষ্টানিকভাবে কসোভোর সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলার ঘোষণা দেয়। এই সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ২২। ইতিমধ্যে এর ৫ সদস্য কসোভোর স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি প্রদান করেছে।

প্রতিক্রিয়া, আলোচনা ও সমালোচনা

আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়াঃ কসোভোর স্বাধীনতা ঘোষণার পর আন্তর্জাতিক অঙ্গনে মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানী ও ইতালী সদ্য স্বাধীন কসোভো রাষ্ট্রের স্বীকৃতিদানের বিষয়টিতে ইতিবাচক সাড়া দেয়। অথচ ঠিক একই সময়ে উল্টো দিকে নিজেদের বিচ্ছিন্নতাবাদী দলগুলোর আত্মবিশ্বাস বাড়তে পারে এই ভেবে অস্থির গ্রিস, স্পেন, স্লোভেনিয়া ও বুলগেরিয়া সদ্য স্বাধীন কসোভোর স্বীকৃতিদানের প্রশ্নে বেঁকে বসে। তুর্কি নিয়ন্ত্রিত উত্তরাংশকে হারানোর ভয়ে সাইপ্রাস খুব সম্ভবত কখনোই ইউরোপের এ নতুন রাষ্ট্রটিকে স্বীকৃতি দেবে না। কসোভোর ব্যাপারে রাশিয়ার বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গির কারণ যতটা না সার্বিয়ার প্রতি তার সমর্থন, তার চেয়েও বেশি নিজের স্বার্থ-দেশটির নিজস্ব বিচ্ছিন্নতাবাদী অঞ্চলগুলোকে ধরে রাখা। আইনগতভাবে রাশিয়া হয়তো একটু শক্ত অবস্থানে আছে।

২০০৮ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারী নেতৃস্থানীয় কিছু পশ্চিমা দেশ কসোভোর স্বাধীনতার প্রতি আনুষ্ঠানিক শুভ কামনা জানায়। স্বাধীনতা ঘোষণার পরদিন জাতিগতভাবে বিভক্ত মেট্রোভিজ শহরের নেতারা কসোভোর বিদেশী পৃষ্ঠপোষকদের নিন্দা করেছিলেন। একই সময় প্রিষ্টিনার জাতিগত আলবেনিয়নরা বিষয়টি উদ্যোগের সাথে পর্যবেক্ষণ করে। কিন্তু অন্যান্য দেশে যারা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের মোকাবেলা করে আসছে যেমন আজারবাইজান, শ্রীলংকা ও চীনের মতো দেশগুলো কসোভোর স্বাধীনতা বিরোধীতায় এখনো অনমনীয় অবস্থানে রয়েছে। এ

দেশগুলো যে, বিষয়টি ভয় করছে সেটি হচ্ছে তাদের নিজেদের আঞ্চলিক অখন্ডতার ভবিষ্যৎ। অন্যদিকে গ্রীস, স্লোভেনিয়া, বুলগেরিয়া এবং রোমানিয়া ও স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বীকৃতিদানের বিবৃতি দেয়ার আগে ইউরোপের কণ্ঠস্বর শোনার অপেক্ষা করছিল। বিবৃতিতে আমেরিকা কসোভোর পক্ষ নিয়ে ঘোষণা করে এটি একটি বিশেষ ইস্যু যাকে পৃথিবীর আর কোন ঘটনার নজির বলা যায় না। অন্যদিকে একই দিনে রাশিয়া ঘোষণা করেছে যে, কসোভো ঠিক তাই যা আমেরিকা অস্বীকার করছে। রাশিয়া বলছে কসোভো একটি আন্তর্জাতিক নজির থাকলো।"

রাশিয়া বর্তমান বিশ্বের চলমান আঞ্চলিক সংঘাতসমূহকে কসোভোর ব্যাপারটি মাথায় রেখেই বিবেচনা করার সিদ্ধান্ত নেয়। সার্বিয়ান অঞ্চলে বিচ্ছিন্নতার পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে রাশিয়া তার সাবেক (ইউএসএসআর) প্রদেশ জর্জিয়ার সাউথ ওসোটিয়া (Ossetia) ও (Abkhazia) আবখাজিয়া অঞ্চলকে স্বীকৃতি দেয়ার হুমকি দেয়। (উল্লেখ্য যে, এ অঞ্চলদ্বয় দীর্ঘ দিন থেকে স্বাধীনতার দাবি জানিয়ে আসছে)। ঘোষণায় আরো বলা হয় যে, স্বাধীন কসোভোকে পশ্চিমাদের গ্রহণ করে নেয়ার মাধ্যমে স্পষ্টতই রাশিয়াকে এ অধিকার দেয়া হয়েছে। কসোভো প্রদেশ কে সার্বিয়া নিজের ধর্ম ও সংস্কৃতির সূতিকাগার বলে মনে করে। মেট্রোভিকা প্রদেশ অপেক্ষায় থাকে ব্রাসেলস বৈঠকরত ইউরোপীয় নেতাদের সিদ্ধান্তের জন্য।[১২] ইউরোপীয়ান নেতারা ওয়াশিংটন তাদের সহযোগিদের ঘোষণার আগেই নিজেরা আগে ভাগে ঘোষণা দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। আশা করা হয়েছিল কসোভোর ব্যাপারে ইউরোপ ও আমেরিকা একই সুরে কথা বলবে। কিন্তু নানা বিষয়ে সবাই একমত হতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে ঘোষণা দেয়ার ব্যাপারটি পৃথকভাবে সদস্য দেশগুলোর ওপর ছেড়ে দেয়া হয়। প্রথমে অসম্মতি প্রকাশ করে স্পেন, দেশটি ঘোষণা করে তারা এমন কোনো কিছুর স্বীকৃতি দেবে না যা তাদের ভাষায় বিচ্ছিন্নতা এবং আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী। কিন্তু গোটা প্রিষ্টিনা আনন্দে মেতে উঠে যখন ফ্রান্স তাদের সমর্থন ব্যক্ত করে। তার কিছুক্ষণ পরেই বৃটেন, জার্মানী ও ইতালী স্বীকৃতি দেয় এবং কসোভোর স্বাধীনতার পক্ষে তাদের অভিমত ব্যক্ত করেন। কসোভোর সরকার জানায়

বর্তমানে তারা ১০০টি দেশের সমর্থনের ব্যাপারে আশাবাদী। উল্লেখ্য, কসোভোর জনসংখ্যার মধ্যে জাতিগত সার্বদের পরিমান মাত্র ৪ শতাংশ।

মুসলিম বিশ্বের প্রতিক্রিয়া: বর্তমান বিশ্বের জাতিসংঘ সদস্যভূক্ত ১৯৫টি দেশের মধ্যে এখন পর্যন্ত মোট ১০৮টি দেশ কসোভোর স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেয়। ১৯৫টি মুসলিম দেশের মধ্যে ৫৭টি দেশের সমন্বয়ে গঠিত ওআইসি তথা "Organization of Islamic Cooperation". এই সংস্থাটির ৫৭টি দেশের মধ্যে মাত্র ২৬টি মুসলিম দেশ কসোভোকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়। কসোভোর স্বাধীনতা ঘোষণার ঠিক পরের দিন অর্থ্যাৎ ১৮ ফেব্রুয়ারী ২০০৮ আফগানিস্তান, আলবেনিয়া, সেনেগাল ইত্যাদি দেশ কসোভোকে স্বীকৃতি প্রদান করেন। ১৪ ও ৩০ অক্টোবর ২০০৮ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও মালেয়িশয়া স্বীকৃতি প্রদান করেন। ২০০১ সালের ৭ জানুয়ারী কাতার ও ৪ ফেব্রুয়ারী ওমান দেশটিকে স্বীকৃতি দেয়। একই বছরের ১১ অক্টোবর এবং ২০১২ সালের ২৫ এপ্রিল ব্রুনাই এবং ১ জুন আফ্রিকার মুসলিম দেশ চাঁদ স্বীকৃতি প্রদান করে। ২৪ ডিসেম্বর ২০১২ সালে পাকিস্তান এবং ২০১৩ সালের ১১ই জুন ইয়েমেন, ২৬ জুন মিশর এবং ২৫ সেপ্টেম্বর লিবিয়া স্বীকৃতি প্রদান করে। কসোভোর স্বাধীনতায় সংখ্যাগুরু আলবেনিয়রা উৎসব পালন করলেও সার্বরা ক্ষেপে যায়।[১৬] কসোভোর স্বাধীনতার প্রশ্নে মুসলিম বিশ্ব মুসলিম বিশ্ব বরাবরের মতই নির্বিকার ও নিশ্চুপ। ৫৭ টি মুসলিম দেশের সংগঠন ওআইসি কসোভোর স্বাধীনতার ঠিক পরদিন অর্থ্যাৎ ১৮ ফেব্রুয়ারী তারিখেই নতুন দেশটিকে স্বাগত জানায় এবং সম্মিলিত বিবৃতি জানিয়ে তাদের দায়িত্ব শেষ করেছে। কাশ্মির, ফিলিস্তিন, চেচনিয়া ও বসনিয়াতে নির্যাতিত নিপীড়িত মুসলমানদের ব্যাপারে ওআইসির যেরূপ ভূমিকা দৃশ্যমান ঠিক তদ্রুপ ভূমিকা পালন করেছে কসোভোর স্বাধীনতার ব্যাপারেও। ওআইসি শুধুমাত্র নামেই রয়েছে এটি একটি মুসলিম বিশ্বের সংগঠন। বাস্তবিক পক্ষে মুসলিম বিশ্বের সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে কোন ধরনের বস্তুনিষ্ঠ পরিলক্ষিত হয় না। ফলে ওআইসি কিংবা আরব লীগের মত সংস্থা থাকা সত্ত্বেও তারা মুসলিম দেশগুলোর কোন সঠিক সমাধান খুঁজে বের করতে পারছেনা। মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে ঐক্য বজায় থাকবে এবং

তারা একে অপরের জন্য সহযোগিতার হাত বাড়াবে এটাই স্বাভাবিক। সৌদি আরব ২০০৯ সালের ২০ এপ্রিল কসোভো প্রজাতন্ত্রকে স্বীকৃতি দেয়ার কথা ঘোষণা করেন। কসোভোর জনগণের সাথে সাংস্কৃতিক বন্ধন এবং কসোভোর জনগণের স্বাধীনতা অর্জনের ইচ্ছার প্রতি সম্মান প্রদান করা হয়েছে। সৌদি আরব আশা করে এই স্বীকৃতির ঘটনা কসোভো ও পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তার ভিত্তি জোরদারে ইতিবাচক অবদান রাখবে।[১৩]

১৭ ফেব্রুয়ারী, ২০০৮ সালে কসোভোর স্বাধীনতা প্রাপ্তি নিঃসন্দেহে একটি বড় অর্জন। বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে নতুন আরেকটি স্বাধীন দেশের অগ্রযাত্রা রচিত হলো। এই সদ্য স্বাধীনতা পাওয়া দেশটিকে আরো শক্তিশালী ও স্বাধীনতার স্থায়ীত্বকে দীর্ঘস্থায়ী করতে প্রয়োজন সকল দেশের আন্তরিক সহোযোগিতা ও সৌহাদ্যপূর্ণ সম্পর্ক। কসোভোর স্বাধীনতা ঘোষনার মধ্য দিয়ে সাবেক সোভিয়েত মিত্র যুগোস্লাভিয়ার ভাঙ্গনের শেষ অধ্যায়টির সমাপ্তি হল। যুগোস্লাভিয়া ভেঙ্গে ৬ষ্ঠ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্ম প্রকাশ করল সার্বিয়ার প্রদেশ কসোভো।

তথ্য নির্দেশ ও টীকা

১। জাতিসংঘ হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ গঠিত হয় মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট জাতিসংঘ নামটি ব্যবহার করেন। আটলান্টিক সনদে জাতিসংঘ নামটি সর্বপ্রথম অফিসিয়ালভাবে ব্যবহৃত হয়। ১৯৪১ সালের আগষ্ট মাসে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনষ্টন চার্চিল ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট আটলান্টিক মহাসাগরে ব্রিটিশরনতরী প্রিন্সেস অব ওয়েলস এ দ্বিপক্ষীয় আলোচনায় মিলিত হন। ১৯৪১ সালের ১২ আগষ্টে তারা একটি শান্তি পরিকল্পনার খসড়া প্রণয়ন করেন। এটি বিখ্যাত আটলান্টিক সনদ নামে খ্যাত। ১৯৪৩ সালে ইরানের তেহরানে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট, ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী চার্চিল এবং সোভিয়েত সেক্রেটারী জেনারেল ষ্ট্যালিন এক বৈঠকে জাতিসংঘ একমত হন। ১৯৪৫ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে যুদ্ধ পরবর্তী ইউরোপের পূনর্গঠনের জন্য রুজভেল্ট চার্চিল এবং ষ্ট্যালিন ইউক্রেনের ইয়ালটায় সম্মেলন মিলিত হন।

২৬ জুন ১৯৪৫ বিশ্বের ৫০টি দেশের প্রতিনিধিরা যুক্তরাষ্ট্রের সান ফ্রান্সিসকোতে ১১১ ধারা সম্বলিত জাতিসংঘের মূল সনদে স্বাক্ষর করেন। ১৯৪৫ সালের ১৫ অক্টোবর ৫১ তম দেশ হিসেবে পোল্যান্ড জাতিসংঘ সনদে স্বাক্ষর করেন। ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫ জাতিসংঘ সনদ কার্যকর হয় এজন্য প্রতি বছর ২৪ অক্টোবর জাতিসংঘ দিবস হিসাবে পালিত হয়।

হালকা নীলের উপর সাদা রঙের জাতিসংঘের প্রতীক। জাতিসংঘের প্রতীকের বর্ণনা মাঝখানে পৃথিবীর মানচিত্র, দুইপাশে দুইটি জলপাই গাছের শাখা। প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ৫১, বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৯৩, সর্বশেষ সদস্য দক্ষিণ সুদান (১৪ জুলাই, ২০১১), প্রাক্তন সদস্য তাইওয়ান (২৫ অক্টোবর, ১৯৭১ চীন জাতিসংঘে অন্তর্ভূক্ত হয় এবং তাইওয়ানকে জাতিসংঘ হতে বহিস্কার করা হয়), আয়তনে জাতিসংঘের বৃহত্তম সদস্য দেশ রাশিয়া, জনসংখ্যায় জাতিসংঘের সদস্য শীর্ষস্থানীয় দেশ চীন, আয়তনে জাতিসংঘের ক্ষুদ্রতম সদস্য দেশ মোনাকো, জনসংখ্যায় জাতিসংঘের ক্ষুদ্রতম দেশ টুভ্যালু। জাতিসংঘের সদর দপ্তর ম্যানহাটন, নিউইয়র্ক যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘের অফিসিয়াল ভাষা ৬টি, ইংরেজী, ফরাসি, চীনা, রুশ, স্প্যানিশ ও আরবি। জাতিসংঘের মূল সংস্থা ৬টি যথা ১। সাধারণ পরিষদ ২। নিরাপত্তা পরিষদ ৩। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ ৪। সচিবালয় ৫। আন্তর্জাতিক আদালত ও ৬। অছি পরিষদ। কসোভো স্বাধীনতা যুদ্ধে জাতিসংঘ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

২। আহম্মেদ, জামিল, 'অবশেষে কসোভো স্বাধীন হলো', *দৈনিক ইনকিলাব*, ১০ এপ্রিল ২০০৮

৩। ওমর, জালাল উদ্দীন, 'কসোভোর স্বাধীনতা প্রয়োজন সবার সহযোগীতা', *দৈনিক ইনকিলাব*, ১০ এপ্রিল ২০০৮।

৪। Roy, Waston 'Serbs vent anger of Kosovo Independence Declaration'*Times online*, 18 February, 2008.

৫। মোহাম্মদ তৌফিকুল হায়দার, মাহমুদুর রহমান, 'বলকান মুসলমানদের প্রতি স্লোভেদান মেলোসেভিসের নীতি: ইতিহাসের নিরিখে বিশ্লেষণ', *সামাজিক বিজ্ঞান পত্রিকা* (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ, পার্ট ডি), খন্ড ৩, সংখ্যা ৩, পৌষ ১৪১৪/ডিসেম্বর ২০০৭ ও পৌষ ১৪১৫/ডিসেম্বর ২০০৮।

৬। *The Dhaka University Studies,* Vol. 67, No. 1, p. 5.

৭। **NATO** এরপূর্ণ রূপ হচ্ছে North Atlantic Treaty Organization. এটি একটি সামরিক সংগঠন। ৪ এপ্রিল, ১৯৪৯ সালে **NATO** প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে **NATO** এর সদস্য সংখ্যা ২৮টি দেশ, যথা-যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড, লুক্সেমবার্গ, ডেনমার্ক, আইসল্যান্ড, ইতালি, নরওয়ে, পর্তুগাল, গ্রিস, তুরস্ক, জার্মানি, সেপন, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, চেক প্রজাতন্ত্র, বুলগেরিয়া, এস্তোনিয়া, লিথুয়ানিয়া, লাটভিয়া, রোমানিয়া, স্লোভেকিয়া, স্লোভেনিয়া, আলবেনিয়া ও ক্রোয়েশিয়া। সর্বশেষ সদস্য দেশ আলবেনিয়া ২টি। যথা-আলবেনিয়া ও তুরস্ক। এর সদর দপ্তর ব্রাসেলস, বেলজিয়াম। এর লক্ষ্য হচ্ছে সদস্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সামরিক আগ্রাসন প্রতিরোধ করা।

৮। *The Dhaka University Studies,* Vol. 67, No. 1, p. 11.

৯। ১৯৫৭ সালের ২৫ মার্চ রোমে পশ্চিম ইউরোপের ৬টি দেশের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এটি রোম চুক্তি নামে পরিচিত। স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুসারে ১৯৫৮ সালের ১ জানুয়ারি বেলজিয়াম, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি, ইতালি, লুক্সেমবার্গ ও নেদারল্যান্ড ইইসি প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে ১৯১২ সালের ৭ ফেব্রুয়ারী নেদারল্যান্ডের ম্যাসট্রিচটে ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। যা ম্যাসট্রিচটে চুক্তি নামে পরিচিত। ১৯৯৩ সালের ১ নভেম্বর চুক্তিটি কার্যকর হয়। এই চুক্তির ফলে ইউরোপীয়ান ইউনিয়ান এবং ইউরোপের একক মুদ্রা চালু হয়। বর্তমান সদস্য দেশ ২৮টি। সর্বশেষ সদস্য দেশ রুমানিয়া ও

বুলগেরিয়া কিন্তু এর পর ১ জুলাই ২০১৩ ক্রোয়েশিয়া ২৮ তম সদস্য পদ লাভ করে। সদর দপ্তর ব্রাজেলস, বেলজিয়াম। বর্তমানে ইউরোপীয় ইউনিয়ন বিশ্বের বৃহত্তম, বানিজ্যিক ব্লক। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যভূক্ত দেশগুলোর নাগরিকেরা পাসপোর্ট ও ভিসা ছাড়াই ইউনিয়নভূক্ত দেশগুলোতে যাতায়াত করতে পারে।

১০। ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ সালে মরক্কোর রাজধানী রাবাতে ও আই সি গঠিত হয়। ১৯৬৭ সালে আরব-ইসরাইল যুদ্ধে ইসরাইল জয়ী হলে বিস্তীর্ণ আরব ভূখন্ড দখল করে নেয়। ইসরাইল ১৯৬৯ সালের ২১ আগষ্ট ইসলাম ধর্মের অন্যতম পবিত্র একটি স্থান জেরুজালেমের বায়তুল মুকাদ্দাস মসজিদ আগুন লাগিয়ে দেয়। এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে ১৯৬৯ সালের ২২ সেপ্টেম্বর মরক্কোর রাজধানী রাবাতে মুসলিম দেশের উম্মাহর স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ইসলামি সম্মেলন সংস্থা, গঠিত হয়। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী টেংকু আব্দুর রহমান এর প্রথম সেক্রেটারি জেনারেল নিযুক্ত হন। বর্তমানে সদস্য দেশ ৫৭ এ সংস্থার সর্বশেষ সদস্য রাষ্ট্র আইভরিকোষ্ট। সাধারণত বিশ্বের মুসলিম শাসিত রাষ্ট্র বা মুসলিম রাষ্ট্র এ সংস্থার সদস্য। মুসলিম প্রধান নয় কিন্তু এ সংস্থার সদস্য এমন দেশ সমূহের মধ্যে রয়েছে, উগান্ডা, ক্যামেরুন, বেনিন, মোজাম্বিক, গয়ানা এবং জেদ্দা, সৌদি আরব। এর অঙ্গ সংস্থা চারটি যথা ১। রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার প্রধানদের সম্মেলন ২। পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সম্মেলন ৩। সাধারণ সচিবালয় এবং ৪। আন্তর্জাতিক ইসলামি আদালত।

১১। ২২ মার্চ ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। আরবলীগের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য দেশ ৬টি। সৌদি আরব, ইরাক, মিশর, লেবানন, জর্ডান এবং সিরিয়া। ৫ মে, ১৯৪৫ ইয়েমেন আরবলীগে যোগদান করে। ৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬ প্যালেস্টাইন মুক্তি সংস্থা (পিএলও) আরব লীগের পূর্ণাঙ্গ সদস্যপদ লাভ করে। ১৯৯৩ সালের ২০ নভেম্বর আরবলীগের সর্বশেষ সদস্য দেশ কমোরোসম যোগদান করে। আরবলীগের বর্তমান সদস্য দেশ ২২টি। আরবলীগের প্রতিষ্ঠাকালীন সদর দপ্তর ছিল মিশরের কায়রোতে। কিন্তু ১৯৭৮ সালে মিশর-ইসরাইল ক্যাম্পডেভিড চুক্তির জন্য মিশরকে আরবলীগ হতে বহিস্কার করা হয় এবং সদর দপ্তর তিউনিশায় স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯৯০ সালে মিশর পুনরায় আরবলীগে যোগদান করে এবং সদর দপ্তর কায়রোতে স্থাপিত হয়। আরবলীগের পর্যবেক্ষণ দেশ ৪টি। যথা-ইরিত্রিয়া, ব্রাজিল, ভারত এবং ভেনুজুয়েলা।

১২। Mark Cramer, *Washington Post* U.S.A, 2 March, 2008.

১৩। *দৈনিক নয়া দিগন্ত*, ২০ ফেব্রুয়ারী, ২০০৮।

১৪। *দৈনিক সংগ্রাম*, ২২ এপ্রিল, ২০০৮।

বলকান ও কসোভোর সাথে সম্পৃক্ত কতিপয় দেশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

সার্বিয়াঃ সার্বিয়া এর রাষ্ট্রীয় নাম রিপাবলিক অব সার্বিয়া। রাজধানী বেলগ্রেড, আয়তন ৮৮,৩৬১ বর্গ কিলোমিটার লোক সংখ্যা ৯৯ লক্ষ, জাতীয় ভাষা সার্বিয়ান, মুদ্রা দিনার, জনসংখ্যার মধ্যে মুসলিম হার ৪% এর মাথা পিছু আয় ১০,২৪৮ মার্কিন ডলার।

মন্টিনিগ্রোঃ মন্টিনিগ্রোর রাষ্ট্রীয় নাম রিপাবলিক অব মন্টিনিগ্রো। রাজধানী পোডগোরিকো এর আয়তন ১৩,৮১২ বর্গ কিলোমিটার। লোক স ংখ্যা ৬ লক্ষ। জাতীয় ভাষা সার্বিয়ান ও মন্টিনিগ্রোয়ান, মুদ্রা ইউরো, সার্বিয়ার জনগণের মাথাপিছু আয় ১১,৬৯৯ মার্কিন ডলার।

স্লোভেনিয়াঃ রাষ্ট্রীয় নাম রিপাবলিক অব স্লোভেনিয়া। রাজধানী লুবজানা, আয়তন ২০,২৭৩ বর্গ কিলোমিটার। লোক সংখ্যা ২০ লক্ষ, ভাষা স্লোভেনিয়া, মুদ্রা ইউরো, জনসংখ্যার মধ্যে মুসলিম হার ৯%। মাথা পিছু আয় ২৬,৭৫৩ মার্কিন ডলার, স্বাধীনতা লাভ ২৫ জুন, ১৯৯১ সার্বিয়া থেকে।

স্লোভেকিয়াঃ স্লোভেকিয়ার রাষ্ট্রীয় নাম স্লোভাক রিপাবলিক। রাজধানী ব্রাশ্লোভা, এর আয়তন ৪৮,৮৪৫ বর্গ কিলোমিটার, লোক সংখ্যা ৫৪ লক্ষ, ভাষা স্লোভেন ও ইংরেজী, মুদ্রা ইউরো, জনসংখ্যার মধ্যে মুসলিম হার ৮%। সার্বিয়ার কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে ১ জানুয়ারী ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে।

বসনিয়া অ্যান্ড হারজেগোভিনাঃ বসনিয়া অ্যান্ড হারজেগোভিনা এর রাষ্ট্রীয় নাম বসনিয়া অ্যান্ড হারজেগোভিনা। রাজধানী সারামেভো, আয়তন ৫১,১২৯ বর্গ কিলোমিটার। লোক সংখ্যা ৩৮ লক্ষ যার মধ্যে মুসলিম জনসংখ্যা ৪০%। ভাষা সার্ব ও ইংরেজী মুদ্রা কনভারটিলিমা মার্ক মাথা পিছু আয় ৭,৭৫৪ মার্কিন ডলার।

ক্রোয়েশিয়াঃ ক্রোয়েশিয়ার রাষ্ট্রীয় নাম রিপাবলিক অব ক্রোয়েশিয়া । রাজধানী জাগরেব, আয়তন ৫৬,৫৪২ বর্গ কিলোমিটার। লোক সংখ্যা ২০ লক্ষ যার মধ্যে মুসলিম জনসংখ্যা ৮%।

জাতীয় ভাষা সার্বিয়ান ও বসনিয়ান, মুদ্রা কুনা। মাথা পিছু আয় ১৬,০২৭ মার্কিন ডলার, স্বাধীনতা লাভ করে সার্বিয়ার কাছ থেকে ২৫ জুন, ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে।

রাশিয়াঃ রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় নাম রাশিয়া ফেডারেশন। রাজধানী শহর মসেকা। আয়তন ১,৭০,৭৫,২০০ বর্গ কিলোমিটার। যা বিশ্বের সর্ববৃহত্ত রাষ্ট্র। লোক সংখ্যা ১৪ কোটি ৯ লক্ষ যার মধ্যে মুসলিম জনসংখ্যা ১৪.৫%। ভাষা রাশিয়ান, মুদ্রা রুবেল। মাথা পিছু আয় ১৪,৬৯০ মার্কিন ডলার।

যুক্তরাজ্যঃ যুক্তরাজ্য এর রাষ্ট্রীয় নাম ইউনাইটেড কিংডম অব গ্রেট ব্রিটেন অ্যান্ড নর্দান আয়ার ল্যান্ড। রাজধানী লন্ডন, আয়তন ২,৪৪,৮২০ বর্গ কিলোমিটার। লোক সংখ্যা ৬ কোটি ১৬ লক্ষ যার মধ্যে মুসলিম জনসংখ্যা ৩%। ভাষা ইংরেজী, ওয়েলস, সুট ওগলিক। মুদ্রা পাউন্ড, মাথা পিছু আয় ৩৫,১৩০ মার্কিন ডলার। জাতীয়তা ব্রিটিশ।

ফ্রান্সঃ ফ্রান্স এর রাষ্ট্রীয় নাম ফ্রেন্স রিপাবলিক। রাজধানী প্যারিস, আয়তন ৫,৪৭,০৩০ বর্গ কিলোমিটার। লোকসংখ্যা ৬ কোটি ২৩ লক্ষ যার মধ্যে মুসলিম জনসংখ্যা ৭%। ভাষা ফ্রেন্স, মুদ্রা ইউরো, জাতীয় দিবস ১৪ জুলাই।

সৌদি আরবঃ সৌদি আরব এর রাষ্ট্রীয় নাম কিংডম অব সৌদি আরব কনসাল্টিড। রাজধানী রিয়াদ, আয়তন ১৯,৬০,৫৮২ বর্গ কিলোমিটার। লোক সংখ্যা ২ কোটি ৫৭ লক্ষ যার মধ্যে মুসলিমই ৯৭%। ভাষা আরবি, মুদ্রা সৌদি রিয়াল। মাথা পিছু আয় ২২,৯৩৫ মার্কিন ডলার। জাতীয় দিবস ২৩ সেপ্টেম্বর।

চীনঃ চীন এর রাষ্ট্রীয় নাম পিপলস রিপাবলিক অব চীন। রাজধানী বেইজিং। আয়তন ৯৫,৯৬,৯৬০ বর্গ কিলোমিটার। লোক সংখ্যা ১৩৪ কোটি ৫৮ লক্ষ যার মধ্যে মুসলিম জনগণের ১২%। ভাষা মান্দারিণ, মুদ্রা ইউয়ান মাথাপিছু আয় ৫,৩৮৩ মার্কিন ডলার।

যুক্তরাষ্ট্রঃ যুক্তরাষ্ট্র এর রাষ্ট্রীয় নাম ইউনাইটেড ষ্টেটস অব আমেরিকা। রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসি। আয়তন ৯৬,২৯,০৯১ বর্গ কিলোমিটার। লোক সংখ্যা ৩১ কোটি ৪৭ লক্ষ। ভাষা ইংরেজী, মুদ্রা মার্কিন ডলার, জনসংখ্যার মধ্যে মুসলিম ৩.৫%। মাথাপিছু আয় ৪৫,৫৯২ মার্কিন ডলার। স্বাধীনতা লাভ করে ৪ জুলাই ১৭৭৬ খ্রিষ্টাব্দে যুক্তরাজ্য এর কাছ থেকে।

পঞ্চম অধ্যায়

কসোভো স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফলাফল

আধুনিক বিশ্বে এর প্রভাব

আধুনিক ইউরোপের ইতিহাসে মুসলিম দেশ হিসেবে স্বাধীন কসোভোর উদ্ভব বিশ্ব ইতিহাসে একটি নতুন সংযোজন। ১৩৮৯ সালে প্রথম কসোভো যুদ্ধের মাধ্যমে এ অঞ্চলটি অটোমানদের অধীনস্থ ছিল। এরপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে এ অঞ্চলটি যুগোস্লাভিয়া ফেডারেশনের একটি প্রদেশ হিসেবে গন্য হয়। মার্শাল টিটোর মৃত্যুর পরবর্তীতে স্লোভেদান মিলোসেভিচ ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে তার মুসলিম বিদ্বেষী নীতি কসোভোর স্বাধীনতার স্পৃহাকে ত্বরান্বিত করে। তার প্রেক্ষিতে ২০০৮ সালে ১৭ ফেব্রুয়ারী স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে কসোভোর আর্বিভাব হয় যা ইতোমধ্যে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।আলোচ্য অধ্যায়ে কসোভোর স্বাধীনতা সংগ্রামের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ফলাফল চিহ্নিত করণ এবং এর প্রভাব আধুনিক বিশ্বে কিভাবে প্রভাবিত হয়েছে তা ফুটিয়ে তোলা হবে।

কসোভোর স্বাধীনতা সংগ্রাম আধুনিক ইউরোপের ইতিহাসে বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এর ফলাফল শুধু আধুনিক ইউরোপই নয় বরং সারাবিশ্ব ব্যাপী এক সূদুর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করে ছিল। যার ফলশ্রুতিতে গোটা বিশ্ব দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহ বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানি ও ইটালি একটি স্বাধীন কসোভো রাষ্ট্রের স্বীকৃতিদানকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, অথচ একই সময়ে উল্টো দিকে নিজেদের বিচ্ছিন্নতাবাদী দলগুলোর আত্মবিশ্বাস বাড়তে পারে এই ভেবে অস্থির গ্রিস, স্পেন, স্লোভেনিয়া ও বুলগেরিয়া সদ্য স্বাধীন কসোভোর স্বীকৃতিদানের প্রশ্নে বেঁকে বসে। তারা দেশটির স্বাধীনতার স্বীকৃতিদান প্রশ্নে বিরোধীতা করতে থাকে। এ অবস্থায় কসোভো স্বাধীন হলেও স্বাধীনতা কিন্তু সুরক্ষিত ছিল না। কারণ কসোভো একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র শক্তিশালী সার্বিয়া স্বাধীন কসোভোর অস্তিত্বকে মানতে অস্বীকার করছে। ফলে সার্বিয়া যে কোন সময় কসোভোর স্বাধীনতাকে ধ্বংস করতে আগ্রাসন চালাতে পারে। ১৯৯২ সালে বসনিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করলে সার্বিয়া সেখানে আক্রমন করে। সার্বিয়ার সৈন্যরা বসনিয়ার ২ লাখ মুসলমানকে হত্যা এবং ৬০ হাজার মুসলিম নারীর সম্ভ্রমহানী করেছিল।[১] অবশেষে ১৯৯৫ সালে ডেটন চুক্তির মাধ্যমে বসনিয়া যুদ্ধের অবসান হয়।[২] ভবিষ্যতে কসোভোতে ও সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

ন্যাটোর সেনাবাহিনী না থাকলে সার্বিয়া যে কোন সময় কসোভোর আগ্রাসন চালাতে পারে। এ অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমাদের উপর কসোভোর স্বাধীনতা পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অপরদিকে স্বাধীন কসোভো যাতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারে সে জন্য যুক্তরাষ্ট্র আগে থেকেই শর্ত দিয়েছে কসোভো কখনই আলবেনিয়ার সাথে একীভূত হতে পারবে না। কসোভোর প্রান কেরিজাজে যুক্তরাষ্ট্র ইতোমধ্যেই সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেছে। এমনকি কসোভোর নিজস্ব কোন সেনাবাহিনী ও স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি থাকতে পারবেনা। ন্যাটোর ১৬ হাজার সৈন্য স্থায়ীভাবে কসোভোতে মোতায়েন থাকবে আবার আন্তর্জাতিক তদারকীর নামে কসোভোর অর্থনীতিতে বাজেটের উপর ও আমেরিকান নিয়ন্ত্রন থাকবে। এ অবস্থায় কসোভোর স্বাধীনতা কেবল নামকাওয়াস্তে একটি প্রতিকী স্বাধীনতায় পরিণত হবার সম্ভাবনা এবং এই স্বাধীনতাকে ঘিরে বলকান অঞ্চলে পরাশক্তিগুলোর মাঝে নতুন করে লড়াইয়ের সম্ভাবনা থেকে যায়।

২০০৯ সালের ২ মার্চ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শীতল যুদ্ধ সংক্রান্ত গবেষণা প্রকল্পের পরিচালক মার্ক ক্র্যামার বলেছেন কসোভোর স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রশ্নে যুক্ত রাষ্ট্র সরকার গনতান্ত্রিক বিতর্ক এড়িয়ে গেছে। স্বাধীনতার পথে কসোভোবাসীর দীর্ঘ, কন্টকাকীর্ণ সংগ্রামী এক পথ চলাকে আমরা দেখেছি। কসোভো আজ স্বাধীন আর এই স্বাধীনতার পেছনে যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমাদারে বিরাট ভূমিকা রয়েছে। তবে তাদের সমর্থন দেখে অতিমাত্রায় আনন্দিত হবার কোন কারণ নেই। কসোভোর স্বীকৃতি নিয়ে বিশ্ব রাজনীতির এক অবিশ্বাস্য মেরুকরণ পরিলক্ষিত হচ্ছে।

সৌদি আরবসহ বেশ কয়েকটি দেশে কসোভো তাদের দূতাবাস স্থাপন করেছে এবং সৌদি আরবও কসোভোর রাজধানী প্রিস্টিনায় লিয়াজোঁ অফিস স্থাপন করেছে। কসোভো ইতিমধ্যে ১০ দেশে দূতাবাস ও কনস্যুলেট খুলেছে (২০০৯ সালের তথ্য) ২০১০ সালে আরো ২২ দেশে কসোভো দূতাবাস ও কনস্যুলেট অফিস খুলেছে। কসোভোর রাজধানী পিস্টিনায় ১৭ দেশের

দূতাবাস রয়েছে। ১০ দেশের রয়েছে অনাবাসিক রাষ্ট্রদূত আর ১৩ দেশের আছে লিয়াঁজো অফিস।

স্বাধীনতার কিছু দিন যেতে না যেতেই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট কসোভো এখন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি থেকে শুরুকরে অর্থনৈতিক দুর্দশা মেকাবিলা করছে। তা সত্ত্বেও সংখ্যালঘু সার্বিয়ানদের চূড়ান্তভাবে কসোভোর সম্পৃক্ত হওয়ার আশা দেখা দিয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষক বার্দ হামজাজ বার্তা সংখ্যা এএফপিকে বলেন কসোভো বর্তমানে সামাজিক অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ার দোরগড়ায় উপনীত হয়েছে।

সাবেক কমিউনিস্ট যুগোস্লাভিয়ার সহিংসতা চূড়ান্তভাবে অবসানের পর ২০০৮ সালে স্বাধীনতা ঘোষণা করে কসোভো। সম্প্রতি সেখানে হরতাল, ধর্মঘট মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। পুলিশ ও স্বাস্থ্যকর্মীরা শতভাগ বেতন বৃদ্ধির দাবিতে ধর্মঘট পালন করছে। ধাতব পদার্থ রফতানী আয় নির্ভর জাতীয় অর্থনীতি না পারছে সরকারের জন্য পর্যাপ্ত রাজস্বের যোগান দিতে আর না পারছে প্রতিবছর ৩০ হাজারের মত নতুন কর্মসংস্থান করতে।

সরকারী হিসেবে দেখা যাচ্ছে কসোভো হচ্ছে ইউরোপের সবচেয়ে গরীব দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি দেশ। সেখানকার ৪০ শতাংশ লোক বেকার এবং ৪৫ শতাংশ লোক দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে। যাদের সংখ্যা ২০ লক্ষ্যাধিক। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা ইউরোপের এই নতুন স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশটির প্রাথমিক চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে দাতা দেশগুলোর সক্ষমতা অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। কসোভোর অর্থমন্ত্রী আহমেদ সালেহ বলেন, তারা আশা করছেন দাতাদেশগুলোর পুরোপুরি সহায়তা পেলে প্রাথমিক চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে। এছাড়া দেশটি তাদেরকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য অন্যান্য দেশের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী সিকান্দার হুসাইনী বলেন, এখন পর্যন্ত বিপুল সংখ্যক দেশ তাদের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেয়নি। তারা আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারের রায়ের অপেক্ষায় রয়েছেন। অবশ্যই সার্বিয়া এখন পর্যন্ত কসোভোকে তাদের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় প্রদেশ

হিসেবেই বিবেচনা করে থাকে। তারা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলেছে তাদের স্বাধীনতা আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের কাছে এখন পর্যন্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেনি।

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশটির সরকারী কর্তৃপক্ষ জনগণকে শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, বর্তমান চ্যালেঞ্জ বিশেষ করে অর্থনৈতিক দুর্ঘটনা মোকাবিলায় আরো সময় প্রয়োজন। জনপ্রশাসন মন্ত্রী আরসিম রাজরামী বলেন, জনগণ আশা করছে স্বাধীনতার সাথে দ্রুত সামাজিক কল্যান প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। তিনি আরো বলেন এক সাথে সকল প্রত্যাশা পূরণ সম্বব হয় না। মন্ত্রী আরো উল্লেখ করেন যে, গত নির্বাচনে সার্বদের উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণসহ কিছু ইতিবাচক উন্নতি সাধিত হয়েছে। তিনি বলেন এটা একটা উৎসাহ ব্যঞ্জক ঘটনা যে, স্থানীয় সার্বরা নতুন স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশটির বাস্তব অবস্থা বুঝতে শুরুকরেছে। কসোভোর স্বাধীনতালাভের পর প্রথম বারের মতো স্থানীয় নির্বাচনে অনেক সার্ব তাদের ভোট প্রয়োগ করে। ভোট বর্জনের ডাক দেয়া সত্ত্বেও তা উপেক্ষা করে বিপুল সংখ্যক সার্ব ভোটে অংশ নেয়। মন্ত্রী বাজরামী বলেন চারটি পৌর এলাকায় সার্বরা বিজয়ী হয়। কসোভোর ২০ লাখের লোকের মধ্যে ৯০ শতাংশ আলবেনীয় বংশোদ্ভূত। বাকীরা রোমা, বসনীয়, গ্রোজনী অথবা স্লোভিক মুসলিম সম্প্রদায়ের লোক।

আধুনিক বিশ্বে এর প্রভাবঃ কসোভোর স্বাধীনতা ঘোষণা আধুনিক বিশ্বের সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের মধ্যে একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা হিসেবে রূপ লাভ করেছে। স্নায়ু যুদ্ধোত্তর নতুন বিশ্ব ব্যবস্থায় এটি এক সম্পূর্ণ নতুন পরিস্থিতি। কারণ সেই যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমারা বছরের পর বছর ধরে ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, মিন্দানাও এবং চেচনিয়াসহ অসংখ্য মুসলিম জনপদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে দমনের জন্য দখলদার ইসরাইল, ভারত, ফিলিপাইন এবং রাশিয়াকে সমর্থণ ও সহযোগিতা করছে। এর পিছনে এক বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে। আর তা হচ্ছে সার্বিয়াকে খন্ডিত করা এবং এর মাধ্যমে ইউরোপের বুকে রাশিয়ার ক্রমবর্ধমান

প্রভাবকে প্রতিহত করা। এছাড়া কসোভোর খনিজ সম্পদকে হস্তগত করা ও কাস্পিয়ান সাগর অঞ্চলের তেল গ্যাসকে পাইপ লাইনের মাধ্যমে অবাধে কসোভোর ভিতর দিয়ে নিয়ে যাওয়াটা ও কসোভোকে স্বাধীন করার অন্যতম উদ্দেশ্য হতে পারে বলে অনেকের ধারণা।

পশ্চিমারা মুসলমানদের কল্যানের উদ্দেশ্যে ইউরোপের বুকে স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র কসোভো অভ্যূদ্বয়ের জন্য কাজ করলে ও বৃহৎ শক্তিবর্গের ভিন্ন উদ্দেশ্য থাকতে পারে। নিরাপত্তা পরিষদের বাইরে রাশিয়া ও চীনের সাথে কসোভোর স্বাধীনতার বিপক্ষে জোট বেঁধেছে ভারত। বিষয়টি সবাইকে বিস্মিত করেছে। দেশ তিনটি একটি যৌথ বিবৃতির মাধ্যমে বেলগ্রেড ও প্রিস্টিনাকে আলোচনার টেবিলে নিয়ে যেতে অনুরোধ জানিয়েছে, যা স্পষ্টত কসোভোর স্বাধীনতা বিপক্ষে অবস্থান। সার্বিয়ার প্রেসিডেন্ট বরিস তাদিস বলেছেন আমরা আলোচনা করার পক্ষপাতি, যা একটি সত্যিকারের আপস সমাধানের দিকে নিয়ে যাবে এবং অন্য কারও সহযোগিতা ছাড়া টিকে থাকতে পারে। তিনি আরও বলেন কসোভোকে এটা মনে রাখতে হবে, সার্বিয়ার সমর্থন ছাড়া তারা জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র হতে পারবে না। আর কসোভোর স্বাধীনতাকে চ্যালেঞ্জ করে আন্তর্জাতিক আদালতে যে মামলা আছে ঠিক এ ব্যাপারে কসোভোকে অবশ্যই ধৈর্য্যের পরিচয় দিতে হবে। এটি নিশ্চিত গণতান্ত্রিক সার্বিয়া আর কখনোই যুদ্ধের দিকে যাবে না এবং অন্য নাগরিকদের কোন প্রকার হুমকি দেবে না।[৩]

কসোভোর স্বাধীনতা প্রশ্নে বাংলাদেশের অবস্থান: কসোভো ও ইসরাইলকে স্বীকৃতি দিতে আপত্তি কোথায়? শিরোনামে ১৬ নভেম্বর ২০০৯ সালের বিকাল ৫:২২ মিনিটের একটি অনলাইন পত্রিকার নিউজ নব্য স্বাধীন মুসলিম ইউরোপীয় রাষ্ট্র কসোভোকে স্বীকৃতি দিতে অস্বাভাবিক সময় নিচ্ছে বাংলাদেশ। ইসরাইলের স্বীকৃতির প্রশ্ন ও ঝুলে আছে কয়েক যুগ ধরে। ২০০৮ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী কসোভো স্বাধীনতা ঘোষণা করে। আর ইসরাইলের জন্ম ১৯৪৮ সালের ১৪ই মে, কসোভো প্রশ্নে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ মিত্র যুক্তরাষ্ট্রের ধারাবাহিক তাগিদ

থাকলেও অগণতান্ত্রিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মতো বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার ও স্বীকৃতির বিষয়টি নিয়ে সময় ক্ষেপণের কৌশল গ্রহণ করেছে।

আর বাংলাদেশ হচ্ছে একমাত্র মুসলিম দেশ যে তার জন্মের পর থেকেই ইসরাইলের সঙ্গে সব ধরণের সম্পর্ক ছিন্ন রেখেছে। কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, এ দুই দেশের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা না রাখার প্রশ্নে বাংলাদেশের অবস্থান বাস্তবতার নিরিখে পুর্নবিবেচনা করা প্রয়োজন। কসোভো প্রশ্নে বাংলাদেশকে মার্কিন চাপ নয় উদার মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে নিজের পরিচয়কে কসোভোর স্বাধীনতার স্বীকৃতির প্রশ্নে বাংলাদেশের সর্বশেষ অবস্থান প্রশ্নে সাবেক পররাষ্ট্র সচিব মিজারচ্ল কায়েস বলেছেন বাংলাদেশের নতুন কোন সিদ্ধান্ত নেই। কসোভোর স্বীকৃতি দেয়ার বিষয়টি বিবেচনায় রেখেছে ঢাকা। তবে এ নিয়ে এখন কোন অগ্রগতি নেই। ঢাকায় নিযুক্ত সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত জেমস এফ মরিয়াটি ২০০৯ সালের ১৯ আগষ্ট পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডা: দীপুমনির সাথে সাক্ষাৎকার কসোভোকে স্বীকৃতি দেয়ার অনুরোধ রাখেন; দীপু মনি ও তখন বলেছিলেন, কসোভোর স্বীকৃতির বিষয়টি বাংলাদেশের বিবেচনায় রয়েছে। তবে স্বীকৃতি দেয়া পর্যন্ত কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি। উল্লেখ্য যে এটি ছিল বাংলাদেশের মার্কিন সরকারের পক্ষে তৃতীয় দফার অনুরোধ। ২০০৯ সালের ১৫ই নভেম্বর ও আরেক দফা অনুরোধ জানানো হয়েছিল মার্কিন দূতাবাসের তরফ থেকে। এক সময় বাংলাদেশ ইউরোপের মুসলিম রাষ্ট্র কসোভোর স্বীকৃতির প্রশ্নে মুসলিম উম্মাহর স্বীকৃতি না পাওয়ার কথা উল্লেখ করেছিল। সংশ্লিষ্ট কূটনৈতিক সূত্রমতে, ঢাকার তরফ থেকে কসোভোর স্বীকৃতির প্রশ্নে শিগগির কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার সম্ভাবনা নেই। কারণ এখানে রাশিয়া Factor টি প্রবলভাবে কাজ করছে। কসোভোকে স্বীকৃতি না দিতে রাশিয়া বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক চিঠি দেয়। বাংলাদেশের রূপপুরে পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে রাশিয়ার প্রত্যক্ষ সহায়তার কথা বিবেচনা রেখে কসোভোকে স্বীকৃতি প্রধানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কূটনৈতিক দাবার বোর্ডে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে।

তথ্য নির্দেশ ও টীকা

১। *দৈনিক ইনকিলাব*, ৭ মার্চ, ২০০৮।

২। বসনিয়া সমস্যায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল ডেটন শান্তি চুক্তি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওহাইও অংগ রাজ্যের ডটন প্যাটারসন বিমান বাহিনীর ঘাটিতে ১লা নভেম্বর ১৯৯৫ থেকে ২১ দিন ধরে উক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ডেটন চুক্তিতে বিবদমান পদগুলি সকলে আনুষ্ঠানিকভাবে ঐতিহাসিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। এ সময় জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী প্রত্যাহার করে বসনিয়ার ন্যাটোর সৈন্য মোতায়েন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ১৫০ পৃষ্ঠা, ১১টি এ্যানেক্স ও ১০২টি মানচিত্র সম্বলিত ডেটন শান্তি চুক্তি অনুসারে ফেডারেল কাঠামোর আওতায় বর্তমান সীমানা নিয়ে বসনিয়া একক রাষ্ট্র থেকে যাবে। তবে দুটো সত্তায় বিভক্ত হবে। মুসলিম ক্রোয়াট ফেডারেশন ভূখন্ডের ৫১ শতাংশ এবং সার্বিয়ার প্রজাতন্ত্র অবশিষ্ট ৪১ শতাংশের কর্তৃত্ব করবে। উভয় পক্ষের নিজ নিজ প্রেসিডেন্সী ও আইন পরিষদ থাকবে। নির্বাচনের ভিত্তিতে একটি কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত হবে। সারাযেভো হবে অভিন্ন রাজধানী। এই ব্যাপক ভিত্তিক সমঝোতার ফলে বলকান রণাঙ্গনে ৪৩ মাস স্থায়ী যুদ্ধের অবসান ঘটায় এক ক্ষীণ আশা জ্বলে ওঠে।

৩। *প্রাগুক্ত*, ১৬ মে, ২০০৯।

৪। *দৈনিক প্রথম আলো*, ১ মে, ২০০৯।

উপসংহার

কসোভোর স্বাধীনতা সংগ্রাম বর্তমান বিশ্বের বহুল আলোচিত একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। সমসাময়িক সময়ে তথা ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন এর পতনের সাথে সাথে বলকান অঞ্চলে এর প্রভাব বেশী লক্ষ্য করা যায়। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৯২ সালে বসনিয়া-হার্জেগোভিনার ট্রাজেডী বিশ্বের ইতিহাসে একটি অন্যতম হত্যাযজ্ঞ। প্রায় ৩ বছর চলে এই নিধনযজ্ঞ। যার ফলে হাজার হাজার মুসলিম নর-নারীর মৃত্যু ঘটে ও অবকাঠামোর অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়। এর অবসান ঘটলে ও কিছুদিন যেতে না যেতেই আবার মুসলিম নিধনযজ্ঞে মেতে উঠে সার্ব বাহিনী। বসনিয়াতে যে অবস্থার অবতারণা করেছিল কসোভোতে ও তার ব্যতিক্রম ঘটায়নি। হাজার হাজার মুসলিম নর-নারীদের হত্যাযজ্ঞ হয়। সার্বদের আক্রমণের হাত থেকে বাঁচার জন্য বহু মানুষ বাড়ি-ঘর ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিদর্শন সমূহের উপর ধ্বংসের খেলায় মেতে উঠে। অনেক ক্ষয়-ক্ষতি ও অমানবিক হত্যাযজ্ঞে বিশ্ব মানবের বিবেকে নাড়া পড়ে। এক পর্যায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ কতিপয় দেশ এগিয়ে আসে তাদেরকে সার্ব বাহিনীর হাত থেকে রক্ষার জন্য। তারা জাতিসংঘ বাহিনী গঠন করে এবং সার্ব বাহিনীর বিরুদ্ধে দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এক পর্যায়ে সার্ববাহিনী পিছু হঠাতে বাধ্য হয় এবং কসোভো চলতে থাকে জাতিসংঘের ১২৪৪ নং প্রস্তাবের অধীনে। ফিনল্যান্ডের সাবেক প্রেসিডেন্ট মার্কিন আহাতশারীকে সংকট নিরসনে একটি সমাধান বের করার দায়িত্ব দেয়া হয়। এই সমাধান সম্বলিত প্রস্তাবটিই হচ্ছে আহাতশারী প্লান।

কসোভোর স্বাধীনতার ফলে বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে নতুন আরেকটি স্বাধীন দেশের অগ্রযাত্রা রচিত হল। এই সদ্য স্বাধীনতা পাওয়া দেশটিকে আরো শক্তিশালী ও স্বাধীনতার স্থায়ীত্বকে দীর্ঘস্থায়ী করতে প্রয়োজন সকল দেশের আন্তরিক সহযোগিতা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক।

কসোভোর স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে সাবেক সোভিয়েত মিত্র যুগোস্লাভিয়ার ভাঙ্গনের শেষ অধ্যায়টি সমাপ্তি হয়। যুগোস্লাভিয়া ভেঙ্গে ৬ষ্ঠ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে কসোভোর আত্ম প্রকাশ।

একসময় সার্বিয় বাহিনী বসনিয়ায় যেভাবে গণহত্যা চালিয়েছেন, একই ভাবে তারা গণহত্যা চালিয়েছে কসোভোতে। কসোভো যুগোস্লাভিয়ার একটি প্রদেশ হলেও এখানে স্বাধীনতার চেতনা ছিল অনেক বেশি শক্তিশালী। সার্বীয়দের অত্যাচারেই কসোভোর আলবেনীয় বংশোদ্ভূত মুসলমানদেরকে স্বাধীনতা আন্দোলনের দিকে ঠেলে দিয়েছে। বসনিয়ার মুসলমানরাও এভাবে একদিন হাতে অস্ত্র তুলে নিতে বাধ্য হয়েছিল।

সাত মাস আগে যখন কসোভো সংকটের সূত্রপাত হয়। তখন বিশ্ব সম্প্রদায় সেখানে গণহত্যা বন্ধের ব্যাপারে কোন উদ্যোগ নেয়নি। সেদিন যদি উদ্যোগ নেয়া হত, তাহলে বোধ করি আজকের পরিস্থিতি এমন হতনা। কসোভোর গণকবর যখন আবিস্কৃত হয়েছে যখন লাখ লাখ আলবেনীয় মুসলমান তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে পাহাড়-পর্বতে আশ্রয় নিয়েছে, তখন জাতিসংঘের টনক নড়েছিল। কিন্তু ততদিনে অনেক সময় পেরিয়ে গেছে।

প্রশ্ন হচ্ছে কসোভোতে এ ধরণের ঘটনা ঘটলো কেন? এর পিছনে কাজ করছে কসোভোর স্বাধীনতার ইচ্ছা, কসোভোর জনগণ ও সাবেক যুগোস্লাভিয়ার অন্য রিপাবলিকগুলোর মত স্বাধীন হওয়ার দৃঢ় প্রত্যয়। কিন্তু মিলোসেভিচ চাননি কসোভো আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করুক। একসময় যুগোস্লাভিয়া রাষ্ট্রের যে অস্তিত্ব ছিল সেই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব আজ নেই বললেই চলে। মোট ৬টি রিপাবলিক ও ২টি স্বায়ত্বশাসিত প্রদেশ নিয়ে যুগোস্লাভ রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল। ১৯৪৪ সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জোসেফ ব্রোজ টিটো গেরিলা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে যুগোস্লাভিয়ার রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করলেও যুগোস্লাভিয়ার জন্ম মূলত অষ্ট্রো-হাঙ্গেরীয়ান সাম্রাজ্যেও পতনের মধ্য দিয়ে ১৯১৮ সালে ডিসেম্বরে।

এই যুগোস্লাভিয়ার দীর্ঘ ইতিহস জুড়ে আছে সাব আর ক্রোটদের ভেতরকার বৈরিতা, শত্রুতা আর দ্বন্দেও কথা। এখানে এক প্রদেশের ভাষা, সংস্কৃতি আর জীবন দ্বারার সাথে অন্য প্রদেশের কোন মিল ছিল না।

স্লাভ মুসলমান, অর্থোডক্স সার্ব ও ক্যাথলিক ক্রোয়াট অধ্যুষিত কসোভোর জাতিগত সংঘাত অনেক পুরনো। সুদূর প্রাচীনকাল থেকে শুরচকওে বর্তমান পর্যন্ত এই অঞ্চলে সংঘাত চলে এসেছে ইতিহাসের ধারাবাহিকতায়।

কসোভোর প্রতি পাশ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহের লোলুপ দৃষ্টিও অতি পুরাতন। ভৌগোলিক দিক দিয়ে তাই বরাবরই একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূখন্ড। ১৩৮৯ সালে প্রথম কসোভোর যুদ্ধেও পর থেকে কসোভো ওসমানীয়দের অধীনে চলে আসে এবং দীর্ঘ দিন ওসমানীয় তথা মুসলমানদের অধীনে শাসিত হতে থাকে।

এখানে উল্লেখ্য যে, বলকান অঞ্চল এমন একটি স্পর্শকাতর জায়গা মূলত এই অঞ্চলকে ঘিরেই দুটি বিশ্বযুদ্ধেও সৃষ্টি হয়েছিল । এই সমস্যার ক্ষেত্রে সার্বদের সাথে রাশিয়ার মৈত্রীও ঐতিহাসিক এই অঞ্চলে ধর্মীয় দৃষ্টি কোন থেকে মুসলমানরাই সবার শত্রচ। ওসমানীয় শক্তির কারনে মধ্যযুগে এই অঞ্চলে রাশিয়ার হয়নি।

মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৩৩৯-১৯৪৫) পর থেকে স্নায়ু যুদ্ধের রূপ প্রকট আকারে লাভ করতে দেখা যায়। যার একদিকে রাশিয়া ও অপরদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট নেতৃত্বে প্রকাশ পায়। এবং আন্তর্জাতিক অঞ্চলে নয়াবিশ্ব ব্যবস্থার জন্ম হয়। নয়া বিশ্ব ব্যবস্থাকে যে যেভাবেই মূল্যায়ন করা হক না কেন এটা সত্য এই নয়া বিশ্বব্যবস্থায় যুক্ত রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব করার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ কওে ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে টুইন টাওয়ারে সন্ত্রাসী হামলার পর বুশ প্রশাসন একটি আগ্রাসি মনোভাব বিশ্বে যুক্ত রাষ্ট্রের ভূমিকাকে বিতর্কিত করেছে।

এই আগ্রাসি মনোভাব কোন দিকে মোড় নেই তার শুধু আগামি দিনগুলোই বলতে পারে। এখানে মজার ব্যাপার হচ্ছে ২০০১ সালের সেপ্টেম্বও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বানিজ্যিক ভবনে হামলার পর থেকে মুসলিম বিশ্বের প্রতি তাদের বৈরি মনোভার লক্ষ্য করা যায়। এবং সেই সাথে ইরাক, আফগানিস্তান, লিবিয়াসহ কতিপয় মুসলিম দেশ ধ্বংস যজ্ঞে মেতে উঠে। সাথে

সাথে সদ্য স্বাধীন মুসলিম দেশ কসোভোর স্বাধীনতা স্বীকৃতিদেও এবং মিত্রদেশ গুলোকে স্বাধীন রাষ্ট্র কসোভোকে স্বীকৃত দেওয়ার ব্যাপাওে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে থাকে।

তাদের গণমাধ্যম যেভাবে প্রচারিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া, তার্কি, আফগানিস্তান, আলবেনিয়, ইটালী, বলকানের সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্র কসোভোকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডব্লিউ বুশ বলেছেন ইতিহাস একদিন প্রমান করবে কসোভোর স্বাধীনতা ন্যায় সংঘত এবং স্বাধীনতার এই শুভ লগ্নে কসোভোর জনগণকে অভিনন্দন জানান তিনি। অন্যদিকে রাশিয়া, সার্বিয়া, স্পেন, রূমালিয়া, স্লোভাকিয়া ও সাইপ্রাস এ স্বাধীনতা বিরোধীতা অব্যাহত রেখেছে।

আফ্রিকার ৫টি দেশের সফররত তৎকালীন তানজানিয়া, বলেছেন কসোভোর সাথে খুব শীঘ্রই পূর্ণ দেবলোমার্কে রিলেশন স্থাপন করবে।

এর ভূমিকার প্রতিবাদে আগেই ওয়াশিংটন থেকে সার্বেরা তাদের ডিপলোম্যাটদেও প্রত্যাহার করে নেয়। সার্বিয়ার অভিযোগ ২০০৮ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারী রাবিযার কসোভোর পার্লামেন্টে ঘোষিত কসোভোর স্বাধীনতা আন্তর্জাতিক আইনের লংঘন।

কসোভোর স্বাধীনতার ইস্যুতে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ বিভক্ত হয়ে পড়েন। নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে সার্বিয়ান প্রেসিডেন্ট করিস তাদিকের আবেগ-আপ্লুত ভাষণের পর রাশিয়া ও চায়না তাদিকের সাথে একত্মতা প্রকাশ করে।

প্রতিক্রিয়ায় জাতিসংঘের নিযুক্ত বৃটিশ অ্যাব্রবাসাগর বলেন, স্বাধীনতা ইস্যুতে বেলগ্রেড ও প্রিষ্টিনার মধ্যে সমঝোতা না হওয়ার বাস্বব তা মেনে নেয়া এবং কসোভোর ওপর সজাগ দৃষ্টি রাখা উচিত। অপরদিকে কসোভোর স্বাধীনতার বিরোধীতা করে ১৮ ফেব্রুয়ারী ২০০৮ সালের সোমবার সার্বিয়ার পার্লামেন্টে কসোভোর স্বাধীনতার ঘোষণার নিন্দা জানিয়ে একটি প্রস্তাব পাঠ করেন। কসোভান পার্লামেন্টের রবিবারের স্বাধীনতা ঘোষণাকে প্রত্যাখ্যান করে প্রস্তাবে

বলা হয় জাতি সংঘ ও আন্তর্জাতিক আইন কসোভোর উপর বেলগ্রেডের সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করে। কসোভোর স্বাধীনতা পৃথিবীর অন্য দেশের বিচ্ছিন্নতা কসোভোর জন্য দৃষ্ঠান্ত নয়। কসোভোর স্বীকৃতির বিষয়টি প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্র পৃথকভাবে বিবেচনা করবে বলেও সম্মত হন ১৭ জাতির ইইউ পররাষ্ট্র মন্ত্রীরা।

কসোভোর স্বাধীনতা নিয়ে এত বিরাট মত পার্থক্য নিজেদের মধ্যে টানাপড়েনকে মেনে নিতে হচ্ছে অনেকটা দায়ে পড়েই। দায়টা হলো আমেরিকার নেতৃত্বে তার জোটভূক্ত দেশ গুলোর দ্রুত সময় গড়িয়ে যাওয়ায়মার্কিন প্রেসিডেন্ট বদল হলেও মার্কিন প্রশাসন তাদের "Policy-making decision" এ অটল থাকেন।

সেই বিশেষ কাজটা করার মতো সময় তার হাতে নেই। কিন্তু তিনি ও তার প্রশাসন তার সেই গুরুত্বপূর্ণ কাজটির ক্ষেতটা তৈরি করে দিতে পারেন, তাহলে একটি বছর পরে যিনিই হোয়াইট হাউসে প্রবেশ করুন না কেন তার জন্য অর্ধেক কাজ করাই রইল। মার্কিন নীতিনির্ধারকেরা নতুন প্রেসিডেন্টকে দিয়ে বাকি কাজ টা অনায়াসে করিয়ে নিতে পারবেন। এ বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে বৈকি।

আমেরিকা ও তার ইউরোপীয় ও দাসেরাওআবহে কসোভোকে স্বাধীন হতে সাহায্য করার মাধ্যমে যে কেবল রাশিয়াকে একটা শিক্ষা দিচ্ছে তা নয় বরং তারা এটাকে পুজি কওে মুসলিম বিশ্বেও সাথে চলমান তিক্ত সম্পর্ককেও উন্নত করতে চাচ্ছে তাদের আস্থা অর্জন করতে চাচ্ছে।

বিগত বেশ কটি মাস, এমনকি বছরাধিক কালের বেশি সময়কাল কওে আগ্রাসী কূটনীতি চালিয়েও আমেরিকান জোট ইরানে সামরিক হামলার পিছনে মুসলিম দেশগুলোর সমর্থ আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছে।

এ কারনে তৈরি হয়ে থাকা আমেরিকান পরিকল্পনা যেমন বাস্তবায়ন করা যাচ্ছে না, তেমনি সে ইসরাইলকেও নিবৃত্ত করে রেখেছে। একক ভাবে ইসরাইল যেন অতর্কিত হামলা না চালায় সে ব্যাপারেও সজাগ রয়েছে আমেরিকা।

ইসরাইল ক্রমেই অধৈর্য হয়ে যাচ্ছে বসে থাকতে থাকতে। সেটা তার সাম্প্রতিক আচার-আচরণে প্রতীয়মান হচ্ছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বিশেষ করে আমেরিকান জোট আর ইসরাইলের এরকম বৈরি কূটনৈতিক অবস্থার পুরোপুরি ফায়দা তুলে নিচ্ছেন ইরানি প্রেসিডেন্ট আহমাদিনেজাদ।

ইরান তার নেতৃত্বে অতি দ্রুততার সাথে এগিয়ে যাচ্ছে নিজেদের পারমানবিক কর্মসূচি নিয়ে। এটা আমেরিকা, ফ্রান্স, ব্রিটেন ও জার্মানসহ ইউরোপীয় সব শক্তির মাথাব্যথার কারণ। এ অবস্থায় তাদের খুবই দরকার মধ্যপ্রাচ্যেও তেল সমৃদ্ধ আরব দেশগুলোর সমর্থন ইরান বিরোধীযুদ্ধে। তাদের সমর্থন ছাড়া যদি আমেরিকান জোট ইরান আক্রমণ করেই বসে সে ক্ষেত্রে আরব দেশ গুলো বিশেষ করে তেল সমৃদ্ধ দেশগুলো যদি তেলের সরবরাহ নিয়ে তেলেসমাতি করে তবে সেটা হবে আমেরিকা এবং পুরো ইউরোপীয় সরকারগুলোর জন্য এক মারাত্মক পরিণতি।

তাদের অর্থনীতির ব্যাপারটা খারাব হবে। ইতোমধ্যেই প্রায় প্রতিটি ইউরোপীয় দেশই অর্থনৈতিক ভাবে মন্দার কবলে পড়েছে। এ অবস্থা আরো বেশি জটিল হবে এবং তা নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলে যাবে এবং পরিস্থিতি আয়তের বাহিরে চলে যাচ্ছে। বিশেষ করে ইংল্যান্ড, আমেরিকাও জার্মানিসহ তথাকথিত আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের প্রথম কাতারের প্রায় সবকটি দেশে যে অর্থনৈতিক মন্দা চলে তা এতটাই প্রকট হবে যে পুরো আন্তর্জাতিক রাজনীতিই বদলে দেবে। এসব কথা মাথায় রেখে হিসাব করেই তাদের এগুতো হচ্ছে।

সেই হিসাবের অংশই হল কসোভোর স্বাধীনতার প্রতি আমেরিকার ও তার মিত্রদের এই দৃষ্টিভঙ্গি। কসোভো এখনও আন্তর্জাতিক রাজনীতির কেন্দ্র বিন্দু হয়ে উঠেছে। আগামি বেশ

কিছু দিন তাকে এরকম অবস্থাতেই থাকতে হবে তাতে কোন সন্দেহ নাই। এখনো কসোভোকে অনেক পথ যেতে হবে। অতি সহসা জাতিসংঘের স্বীকৃতি এবং তার সদস্য পদ পাওয়াটা তার জন্য হবে এক দূরুহ ব্যাপার।

তাছাড়া ল্যান্ডলকড কসোভো নিজেদের আঞ্চলিক হুমকির মুখে অবস্থান এবং এই বৈরি বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে কতটা দূরদর্শিতা আার সাথে পারে, সেটা একটা বড় বিষয় বটে। কসোভোর প্রায় ২০ লাখ আলবেনীয় জনগোষ্ঠী তাদের জীবন আর রক্ত দিয়ে প্রমান করেছেন, তারা স্বাধীনতা চান। সেই স্বাধীনতা তারা পেয়েছেনও। কিন্তু তারা কি বুঝছেন রক্ত আর জীবনের নজরানা দিয়ে স্বাধীনতা পাওয়া যায় বটে, তবে সেই স্বাধীনতা প্রাপ্তির যে আনন্দ, যে উচ্ছাস তারা এখন ভাসছেন, এই আনন্দ এই উচ্ছাস। কসোভোর জনগণ কি সেই ধৈর্য, প্রজ্ঞা, দেশ প্রেম আর ইস্পাত কঠিন ঐক্যেও নমুনা দেখাতে পারবেন? সেটাই এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। সময়ের গহবরে নিহিত রয়েছে এ প্রশ্নের উত্তর।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিসমাপ্তিতে বলা যায় যে, ২০০৮ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি কসোভোর স্বাধীনতা প্রাপ্তি নি:সন্দেহে একটি বড় অর্জন। যদিও নতুন এ স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশটিকে নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে। স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখা এবং সেটি অর্থবহ করার লক্ষ্যে বৃহৎশক্তিবর্গেও বিশেষকরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়া অপরিহার্য। এক দশকের সংগ্রামী পথ পেরিয়ে কসোভো আজ স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র। মুসলিম কসোভোর স্বাধীনতা প্রাপ্তিক পূর্ব-ইউরোপে ইসলাম ও মুসলমানদেও একটি আলোকবর্তিকা রাষ্ট্র হিসেবে কাজ করবে তাতে সন্দেহ নেই। ক্ষুদ্র এ গণতান্ত্রিক মুসলিম রাষ্ট্রটির কন্টকার্কীর্ণ পথ চলার ক্ষেত্রে মুসলিম বিশ্বেও ইতিবাচক ভূমিকা ও একান্ত কাম্য। কসোভো যাতে আন্তর্জাতিক সমাজের পোষ্য না হয়ে এবং পরাশক্তি সমূহের সকল প্রকার ষড়যন্ত্রকে উপেক্ষা করে ইউরোপের বুকে স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকতে পারে সেজন্য মুসলিম দেশগুলোকে কসোভোর প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। তাছাড়া সদ্য ভূমিষ্ঠ হওয়া একটি শিশু রাষ্ট্রের বেড়ে উঠার

জন্য ও সবার সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। খ্যাতনামা দার্শনিক জর্জ বার্নার্ডশ বলেছিলেন, ইসলাম ইউরোপকে অচিরেই জয় করবে। কসোভোর স্বাধীনতা সেই পথে অগ্রযাত্রার একটি পদক্ষেপ বলে প্রতীয়মান হয়।

সবশেষে বলা যায় যে, আধুনিক ইউরোপের ইতিহাস তথা বলকান অঞ্চলের মুসলমানদের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে কসোভোর স্বাধীনতা সংগ্রাম। ২০০৮ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারী কসোভোর স্বাধীনতা প্রাপ্তি নি:সন্দেহে একটি বড় অর্জন।তবে সবার উপরে এটাই বাস্তব সত্য যে একটি মুসলিম দেশের জন্ম হয়েছে এবং সেই দেশ স্বাধীন কসোভোকে সর্বাত্মকভাবে সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমে দীর্ঘজীবি করা প্রতিটি স্বাধীনচেতা মানুষের কর্তব্য-ধর্ম, বর্ণ, দেশ, কাল, পাত্র ভেদে।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট-১ঃ বলকান অঞ্চলের মানচিত্র

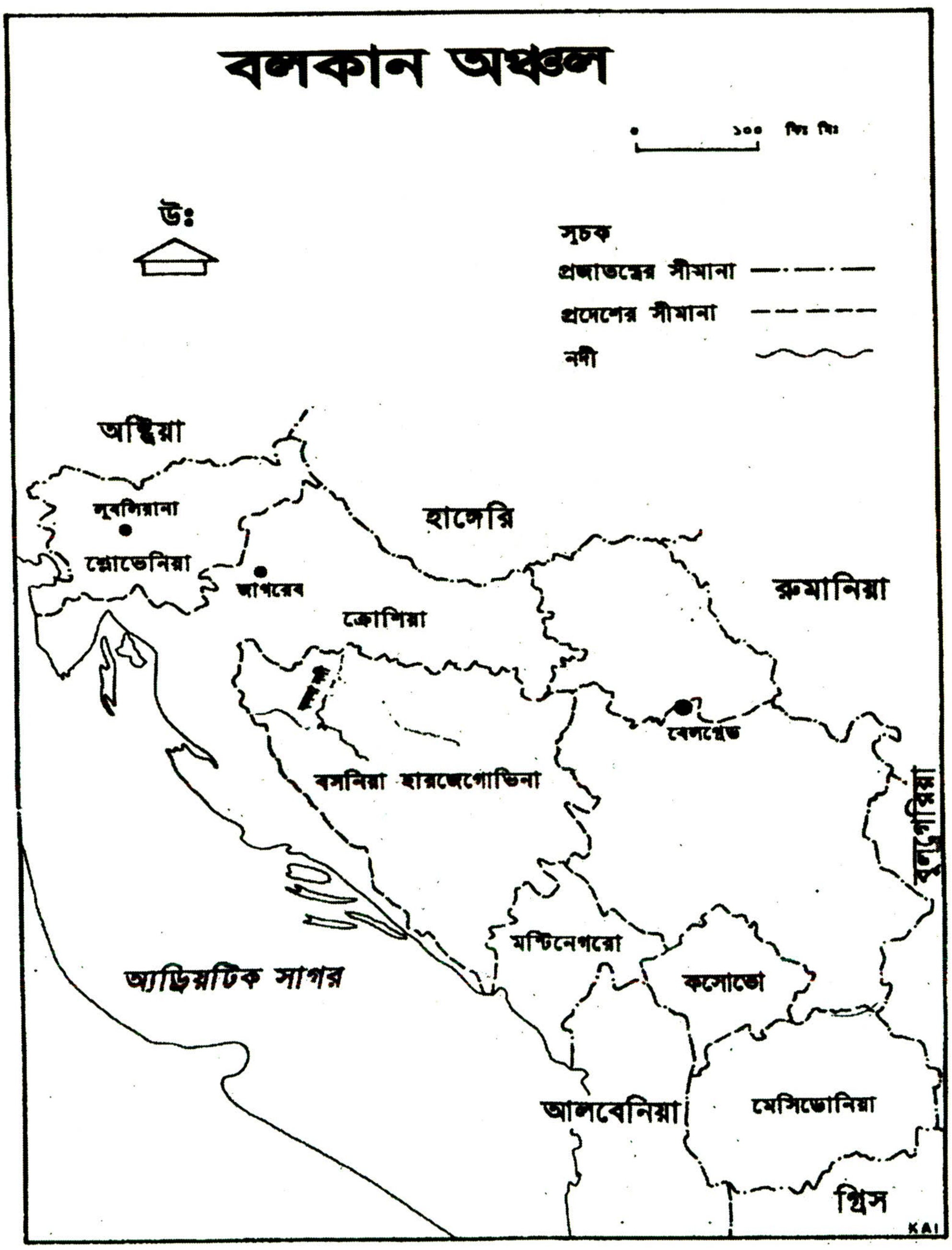

N
Serbia
Montenegro
Mitrovica
Pristina / Prishtina
Pec / Peja
Kosovo
Urosevac / Ferizaj
Prizren
Albania
Macedonia
Kosovo

The Ethnic Breakdown of Kosovo
N
SERBIA
MONT.
ALBANIA
Over 90% Albanian
Albanians living outside Kosovo
Mostly Serbian

SERBIA
MONTENEGRO
BULGARIA
VILAYET OF KOSOVO
VILAYET OF İSKODRA
VILAYET OF MANASTIR
VILAYET OF SELANIK
Other Ottoman territories

Balkans
HUNGARY
N
CROATIA
ROMANIA
BOSNIA &
HERZEGOVINA
SERBIA
MONTENEGRO
KOSOVO
BULGARIA
MACEDONIA
ALBANIA
GREECE

N

পরিশিষ্ট-২ ঃ কসোভোর মানচিত্র

© MAGELLAN Geographix℠ Santa Barbara, CA (800) 929-4627

Sites in Kosovo and southern Central Serbia where NATO aviation used forbidden munition with depleted uranium during 1999 bombing

N
Priština
Kosovo

পরিশিষ্ট-৩ ঃ কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ আলোক চিত্র

১৩৮৯ সালের কসোভো যুদ্ধ

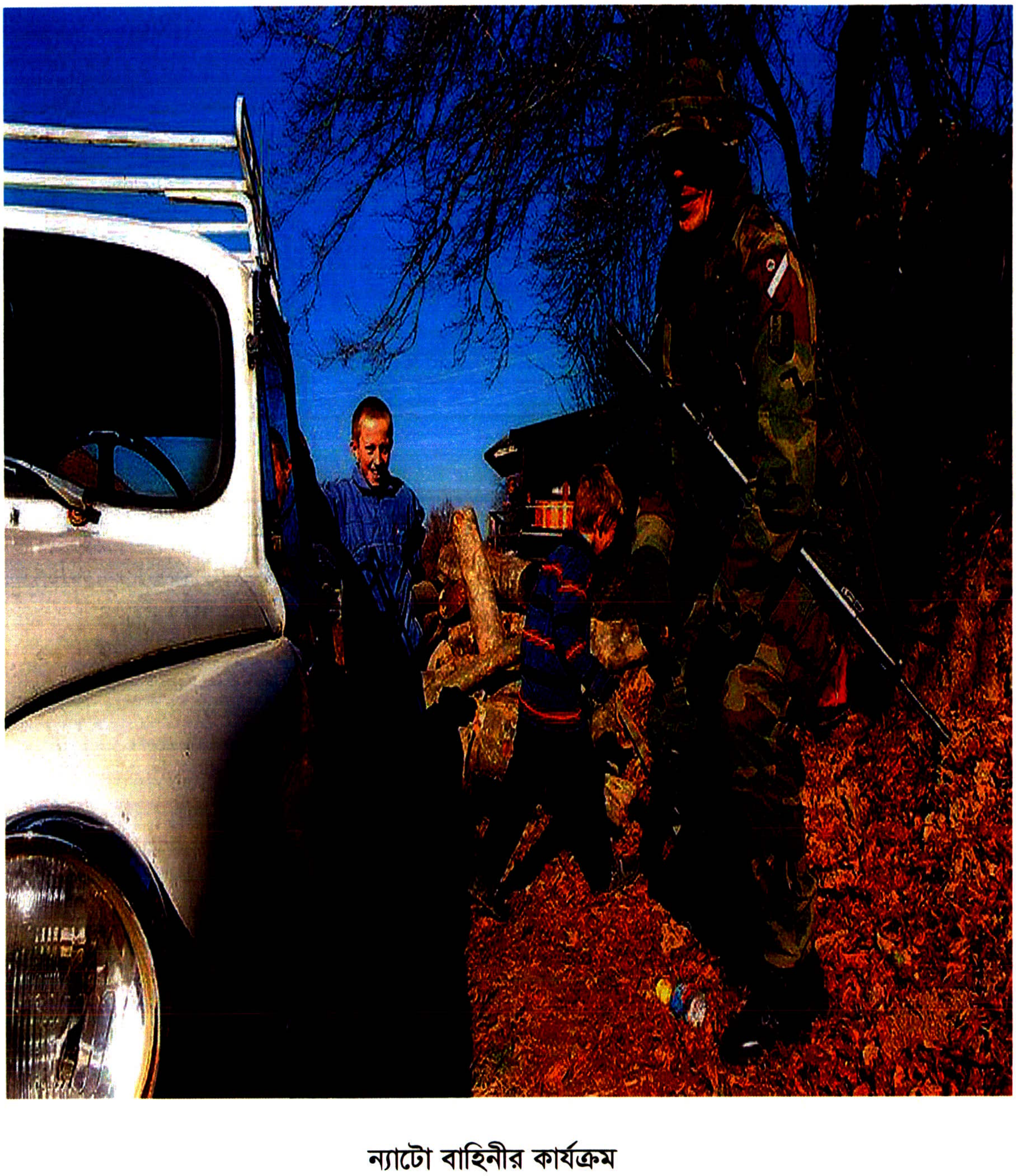

ন্যাটো বাহিনীর কার্যক্রম

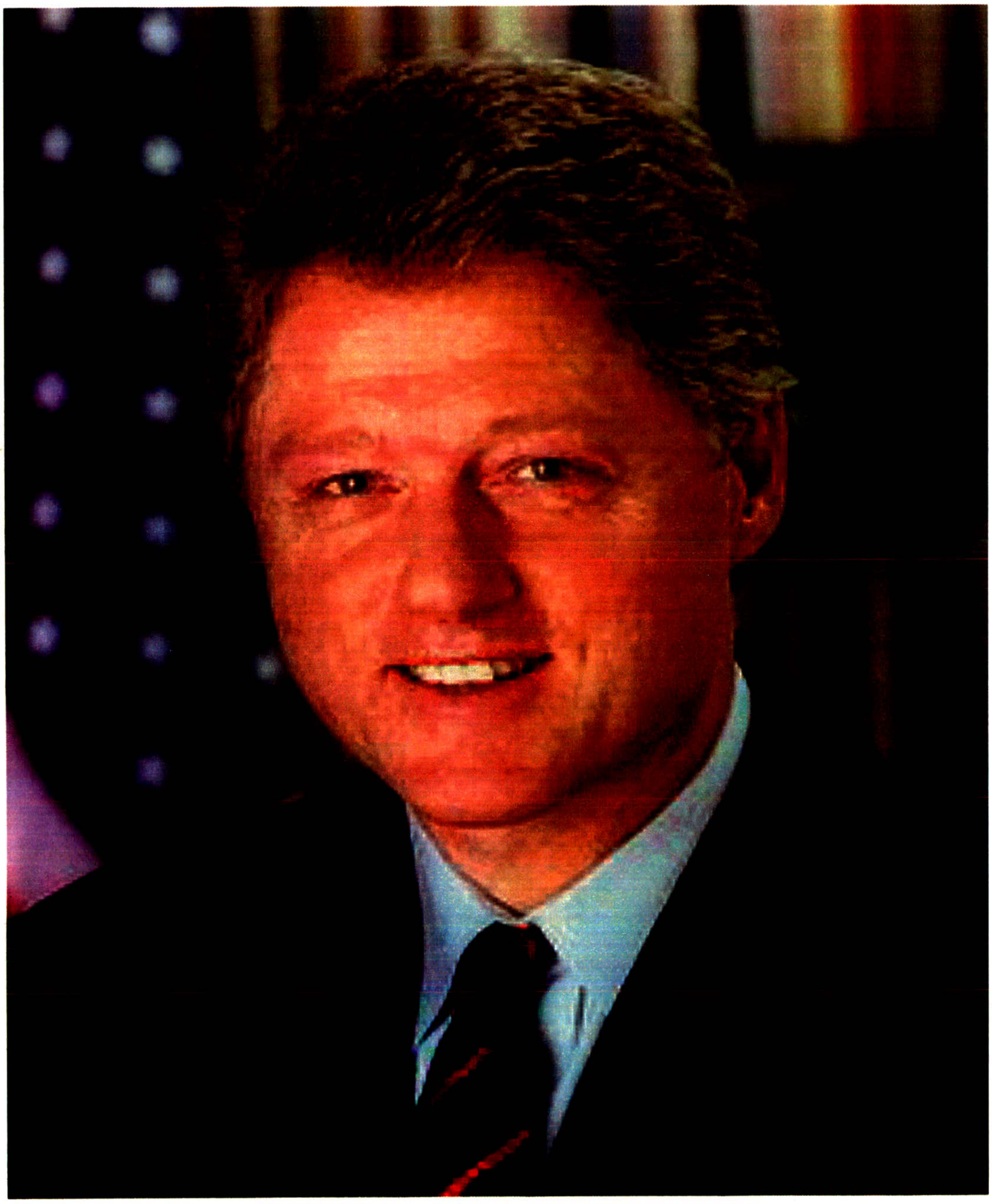

মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন (১৯৪৬-)

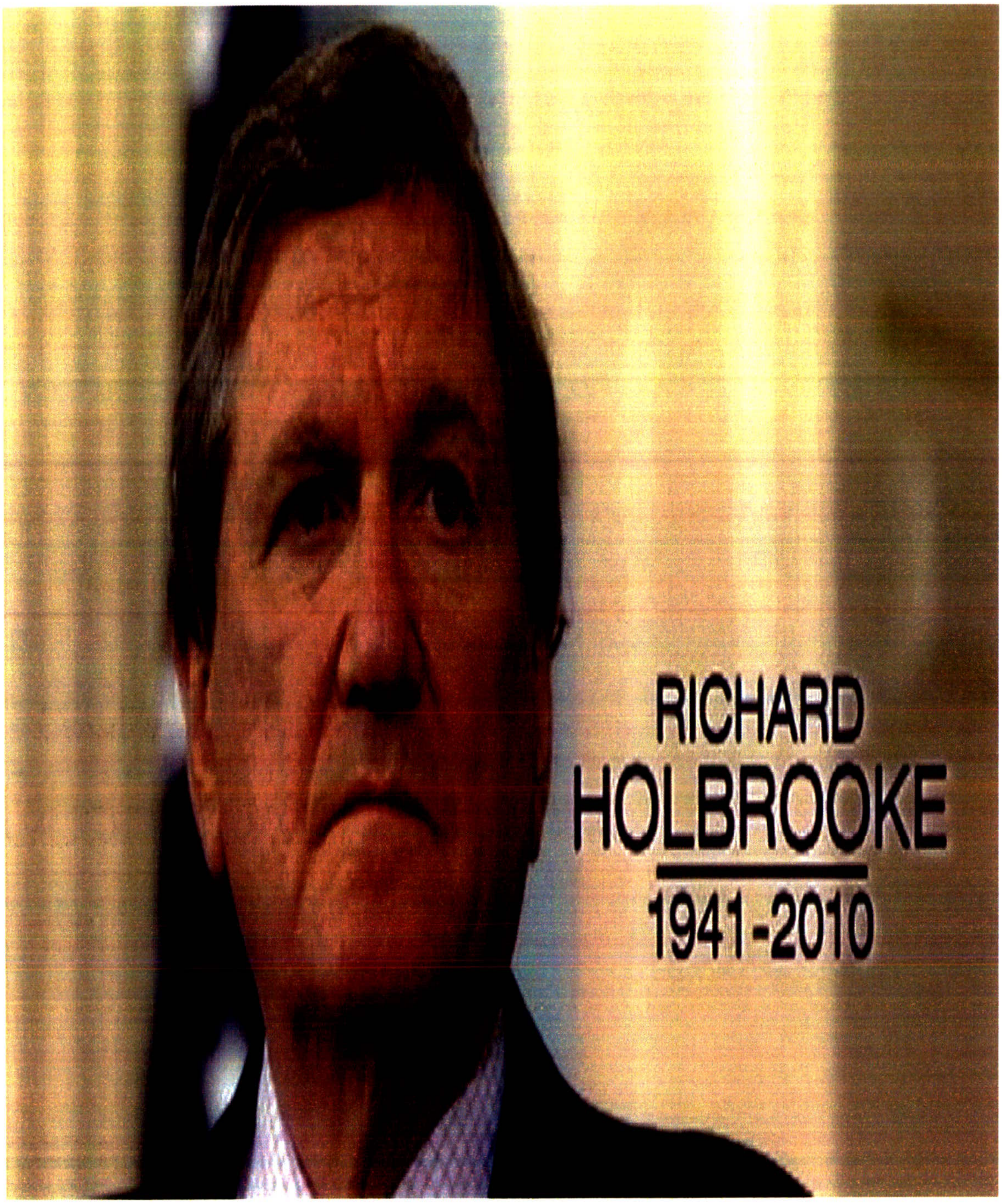
RICHARD
HOLBROOKE
1941-2010

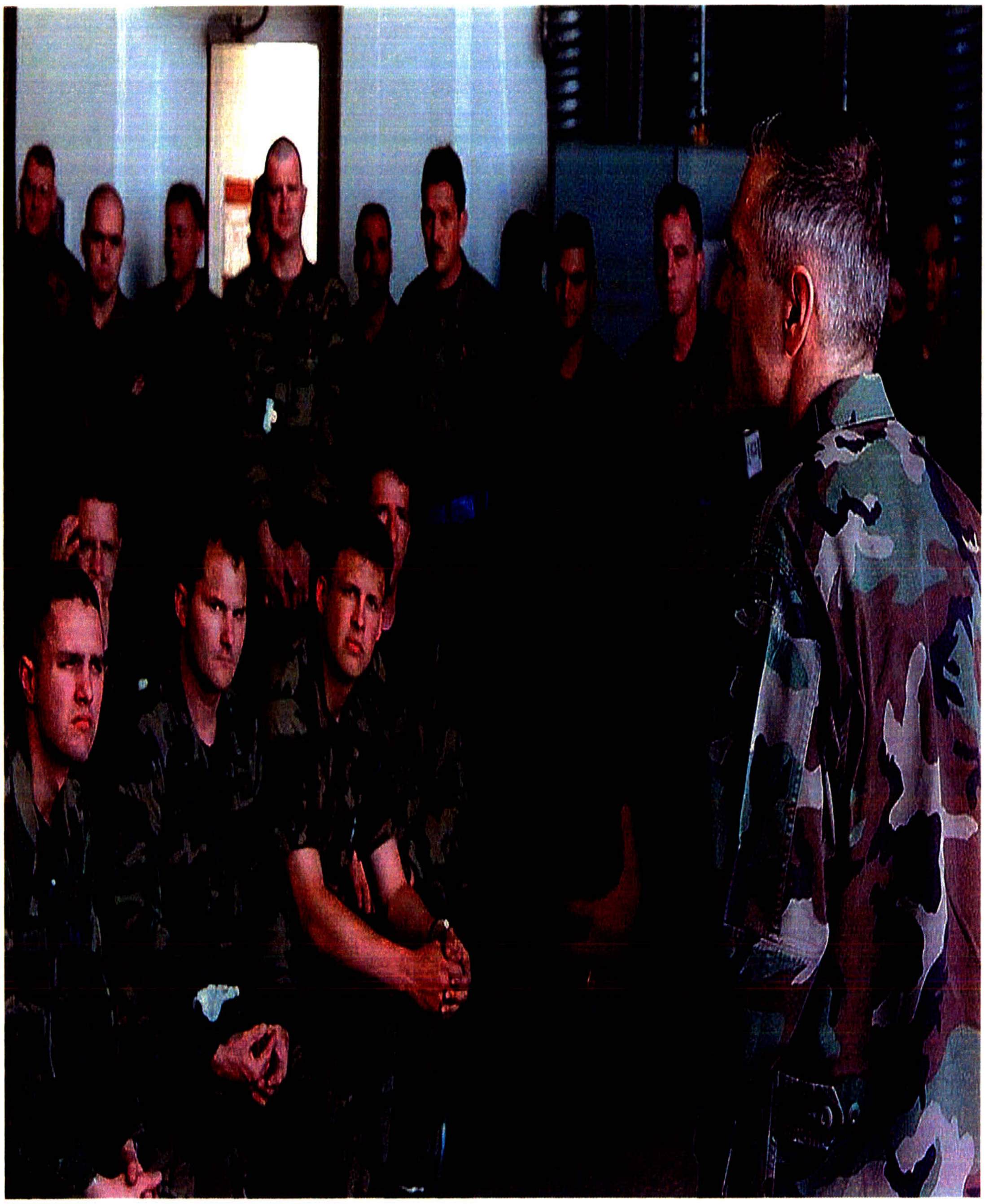

ন্যাটো সেনাবাহিনীর একাংশ

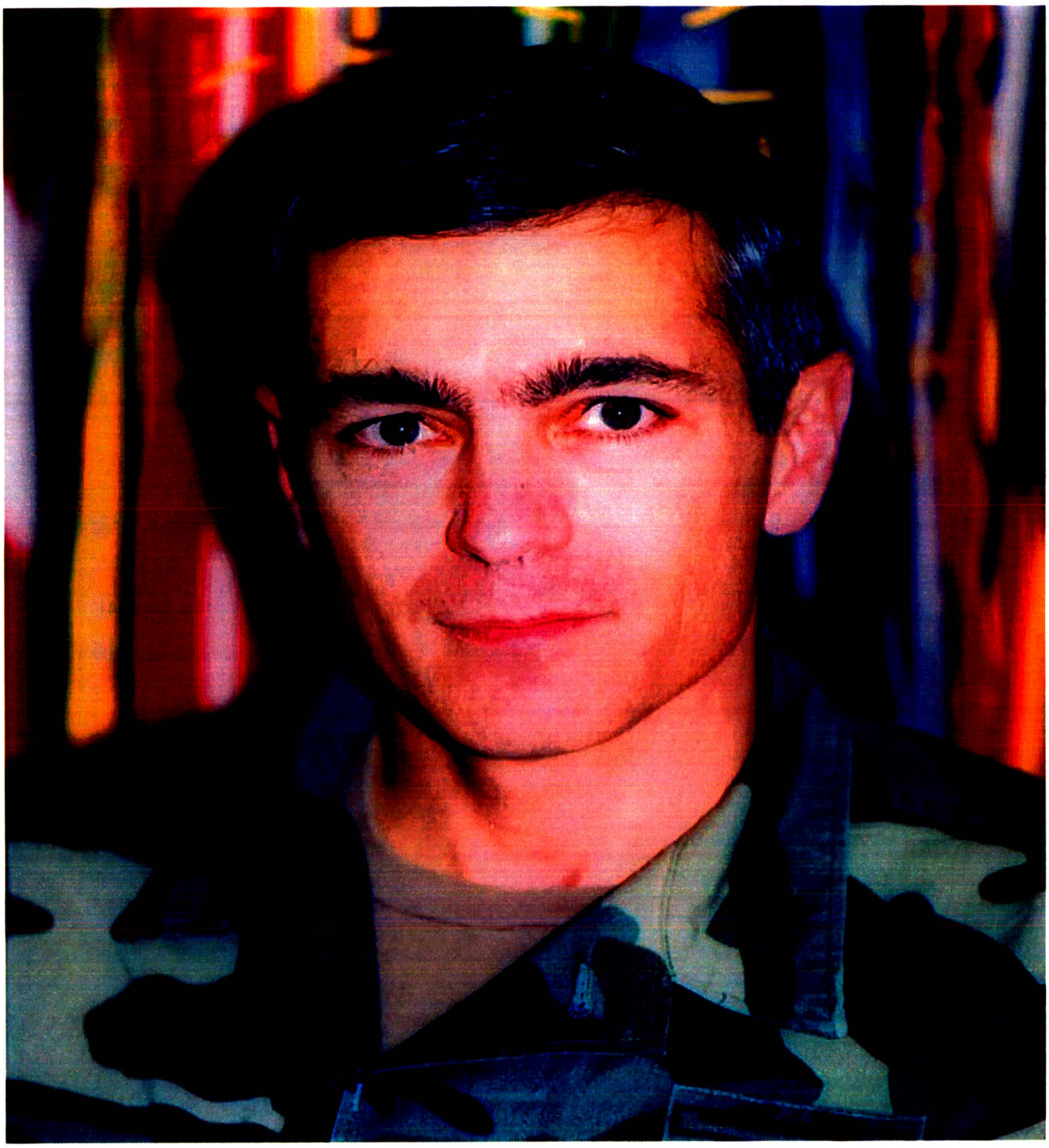

রবার্ট ওয়েলেসলি ক্লার্ক (১৯৪৬-)

যুদ্ধ জাহাজ

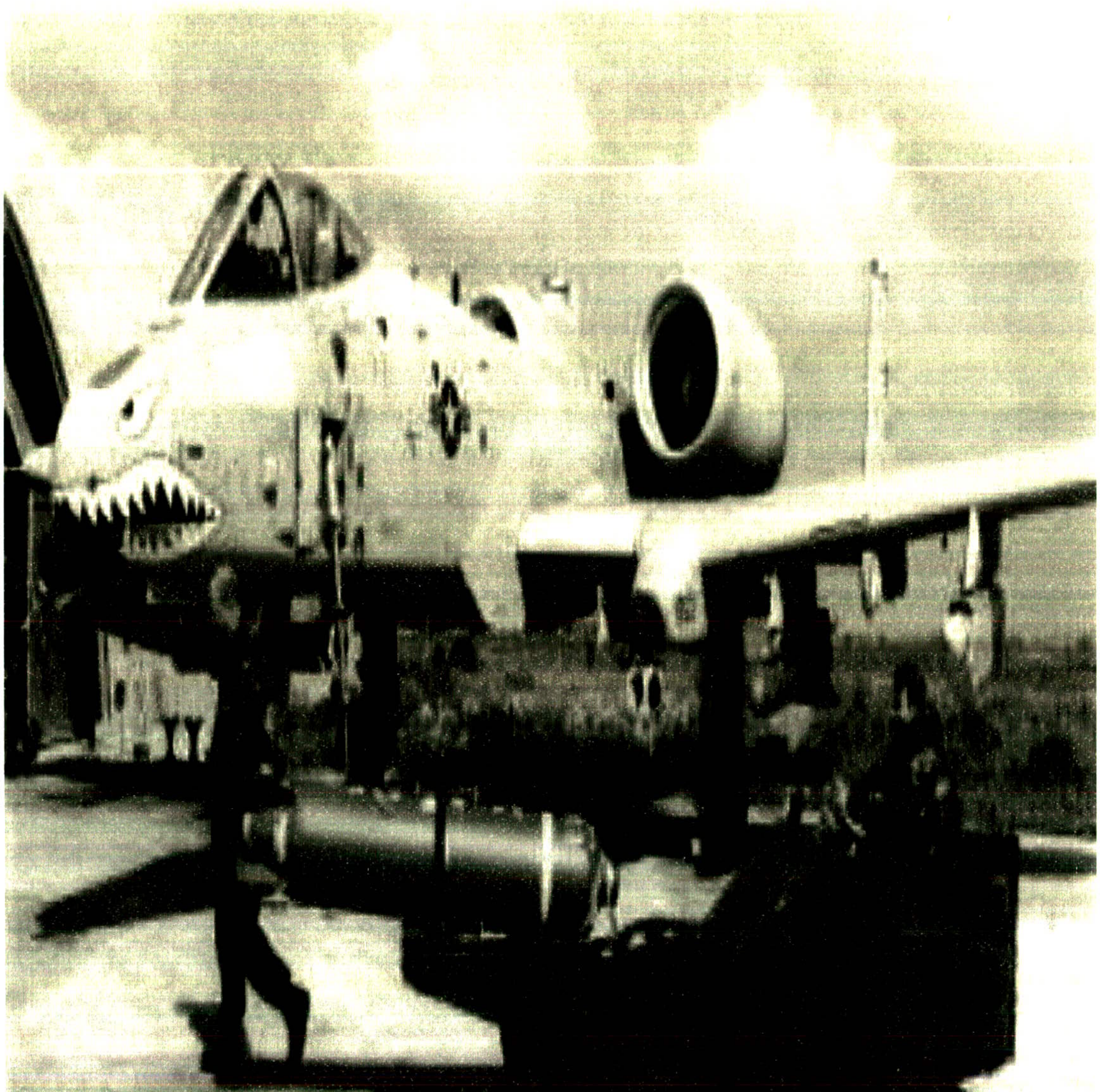

যুদ্ধ সরঞ্জাম

পরিশিষ্ট-৪ ঃ পতাকা

BALKAN STATES
ALBANIA
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
GREECE
KOSOVO
MACEDONIA
MONTENEGRO
ROMANIA
SLOVENIA
SERBIA
TURKEY
www.shutterstock.com · 181106243

পরিশিষ্ট-৫ ঃ কসোভোর সংবিধানের মৌলিক বিষয়াবলী

Constitution of the Republic of Kosovo

We, the people of Kosovo,

Determined to build a future of Kosovo as a free, democratic and peace-loving country that will be a homeland to all of its citizens;

Committed to the creation of a state of free citizens that will guarantee the rights of every citizen, civil freedoms and equality of all citizens before the law; Committed to the state of Kosovo as a state of economic wellbeing and social

prosperity;

Convinced that the state of Kosovo will contribute to the stability of the region

and entire Europe by creating relations of good neighborliness and cooperation

with all neighboring countries;

Convinced that the state of Kosovo will be a dignified member of the family of

peace-loving states in the world;

With the intention of having the state of Kosovo fully participating in the

processes of Euro-Atlantic integration;

In a solemn manner, we approve the Constitution of the Republic of Kosovo.

Basic Provisions of the Constitution of Kosovo

Article 1 [Definition of State]

1. The Republic of Kosovo is an independent, sovereign, democratic, unique and indivisible state.

2. The Republic of Kosovo is a state of its citizens. The Republic of Kosovo exercises its authority based on the respect for human rights and freedoms of its citizens and all other individuals within its borders.

3. The Republic of Kosovo shall have no territorial claims against, and shall seek no union
with, any State or part of any State.

Article 2 [Sovereignty]

1. The sovereignty of the Republic of Kosovo stems from the people, belongs to the people
and is exercised in compliance with the Constitution through elected representatives, referendum and other forms in compliance with the provisions of this Constitution.

2. The sovereignty and territorial integrity of the Republic of Kosovo is intact, inalienable, indivisible and protected by all means provided in this Constitution and the law.

3. The Republic of Kosovo, in order to maintain peace and to protect national interests, may participate in systems of international security.

Article 3 [Equality Before the Law]

1. The Republic of Kosovo is a multi-ethnic society consisting of Albanian and other Communities, governed democratically with full respect for the rule of law through its legislative, executive and judicial institutions.

2. The exercise of public authority in the Republic of Kosovo shall be based upon the principles of equality of all individuals before the law and with full respect for internationally recognized fundamental human rights and freedoms, as well as protection of the rights of and participation by all Communities and their members.

Article 4 [Form of Government and Separation of Power]

1. Kosovo is a democratic Republic based on the principle of separation of powers and the checks and balances among them as provided in this Constitution.

2. The Assembly of the Republic of Kosovo exercises the legislative power.

3. The President of the Republic of Kosovo represents the unity of the people. The President of the Republic of Kosovo is the legitimate representative of the country, internally and externally, and is the guarantor of the democratic functioning of the institutions of the Republic of Kosovo, as provided in this Constitution.

4. The Government of the Republic of Kosovo is responsible for implementation of laws

and state policies and is subject to parliamentarian control.

5. The judicial power is unique and independent and is exercised by courts.

6. The Constitutional Court is an independent organ in protecting the constitutionality and is
the final interpreter of the Constitution.

7. The Republic of Kosovo has institutions for the protection of the constitutional order and territorial integrity, public order and safety, which operate under the constitutional authority of the democratic institutions of the Republic of Kosovo.

Article 5 [Languages]

1. The official languages in the Republic of Kosovo are Albanian and Serbian.

2. Turkish, Bosnian and Roma languages have the status of official languages at the municipal level or will be in official use at all levels as provided by law.

Article 6 [Symbols]

1. The flag, the seal and the anthem are the state symbols of the Republic of Kosovo all of
which reflect its multi-ethnic character.

2. The appearance, display and protection of the flag and other state symbols shall be regulated by law. The display and protection of the national symbols shall be regulated by law.

Article 7 [Values]

1. The constitutional order of the Republic of Kosovo is based on the principles of freedom, peace, democracy, equality, respect for human rights and freedoms and the rule of law, non-discrimination, the right to property, the protection of environment, social justice, pluralism, separation of state powers, and a market economy.

2. The Republic of Kosovo ensures gender equality as a fundamental value for the democratic development of the society, providing equal opportunities for both female and male participation in the political, economic, social, cultural and other areas of societal life.

Article 8 [Secular State]

The Republic of Kosovo is a secular state and is neutral in matters of religious beliefs.

Article 9 [Cultural and Religious Heritage]

The Republic of Kosovo ensures the preservation and protection of its cultural and religious heritage.

Article 10 [Economy]

A market economy with free competition is the basis of the economic order of the Republic of Kosovo.

Article 11 [Currency]

1. The Republic of Kosovo uses as legal tender one single currency.

2. The Central Banking Authority of Kosovo is independent and is called the Central Bank of the Republic of Kosovo.

Article 12 [Local Government]

1. Municipalities are the basic territorial unit of local self-governance in the Republic of Kosovo.

2. The organization and powers of units of local self-government are provided by law.

Article 13 [Capital City]

1. The capital city of the Republic of Kosovo is Pristina.

2. The status and organization of the capital city is provided by law.

Article 14 [Citizenship]

The acquisition and termination of the right of citizenship of the Republic of Kosovo are provided by law.

Article 15 [Citizens Living Abroad]

The Republic of Kosovo protects the interests of its citizens abroad as provided by law.

Article 16 [Supremacy of the Constitution]

1. The Constitution is the highest legal act of the Republic of Kosovo. Laws and other legal
acts shall be in accordance with this Constitution.

2. The power to govern stems from the Constitution.

3. The Republic of Kosovo shall respect international law.

4. Every person and entity in the Republic of Kosovo is subject to the provisions of the Constitution.

Article 17 [International Agreements]

1. The Republic of Kosovo concludes international agreements and becomes a member of international organizations.

2. The Republic of Kosovo participates in international cooperation for promotion and protection of peace, security and human rights.

Article 18 [Ratification of International Agreements]

1. International agreements relating to the following subjects are ratified by two thirds (2/3)

vote of all deputies of the Assembly:

(1) territory, peace, alliances, political and military issues;

(2) fundamental rights and freedoms;

(3) membership of the Republic of Kosovo in international organizations;

(4) the undertaking of financial obligations by the Republic of Kosovo;

2. International agreements other than those in paragraph 1 are ratified upon signature of the President of the Republic of Kosovo.

3. The President of the Republic of Kosovo or the Prime Minister notifies the Assembly whenever an international agreement is signed.

4. Amendment of or withdrawal from international agreements follows the same decision

making process as the ratification of such international agreements.

5. The principles and procedures for ratifying and contesting international agreements are set forth by law.

Article 19 [Applicability of International Law]

1. International agreements ratified by the Republic of Kosovo become part of the internal legal system after their publication in the Official Gazette of the Republic of Kosovo. They are directly applied except for cases when they are not self-applicable and the application requires the promulgation of a law.

2. Ratified international agreements and legally binding norms of international law have superiority over the laws of the Republic of Kosovo.

Article 20 [Delegation of Sovereignty]

1. The Republic of Kosovo may on the basis of ratified international agreements delegate state powers for specific matters to international organizations.

2. If a membership agreement ratified by the Republic of Kosovo for its participation in an international organization explicitly contemplates the direct applicability of the norms of

that organization, then the law ratifying the international agreement must be adopted by

two thirds (2/3) vote of all deputies of the Assembly, and those norms have superiority over the laws of the Republic of Kosovo.

গ্রন্থপঞ্জি

Bibliography

প্রাথমিক উৎস (Primary Sources)

অপ্রকাশিত অভিসন্দর্ভ ও পান্ডুলিপি

Md. Saifullah : OIC-Bangladesh Relations

Mohammad Omar Faruq : Turko- Europe relation

Md. Anisur Rahman : Balkan States and Islamization

মাহমুদুর রহমান : মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের রাজনৈতিক দর্শন

দ্বৈতয়িক উৎস(Secondary Sources)

বাংলা গ্রন্থ

ড. এনামূল হক : *আধুনিক ইরান, তুরস্ক ও মিশর*, ঢাকা, ১৯৬৯।

ড. এম. আব্দুল কাদির : *তুরস্কের ইতিহাস*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৬।

মুহাম্মদ আলী আসগর খান : *আধুনিক তুরস্কের ইতিহাস*, ঢাকা, ১৯৮৪।

হাসান জামান : *কমিনস্ট শাসনে ইসলাম*, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা ২য় সংস্করণ, ১৯৯৭, বাংলা সন।

সফিউদ্দিন জোয়ারদার : *আধুনিক মধ্যপ্রাচ্য*, প্রথম খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৮।

আব্দুল মতিন : *কামাল আতাতুর্কী আধুনিক তুরস্কের জনক*, র‍্যাডিকেল এশিয়া পাবলিকেশন্স, ৩১৭, সিলি রোড, লন্ডন, ২০০৩।

ইয়াহিয়া আরমাজানী : *মধ্যপ্রাচ্য অতীত ও বর্তমান*, ড. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক অনূদিত,জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৬।

ড. শেখ মুহাম্মদ লুৎফুর রহমান :*ওসমানীয় সালতানাত*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯১।

ড. আশরাফ উদ্দিন আহমেদ : *মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮০।

এম.এ কাউসার : মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস (উনিশ ও বিশ শতক) বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী, ঢাকা-১২০৭, জুলাই ২০০২।

এইচ.এ .এল ফিশার : *ইউরোপের ইতিহাস* (১৮০০-১৯৩৫) (অনুবাদ আরশাদ আজিজ) বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৬।

সৈয়দ মাহমুদুল হাসান : *ইসলাম ও আধুনিক বিশ্ব*, ঢাকা, ২০০৪।

এ বি এম হোসেন : *মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস: অটোমান সাম্রাজ্য থেকে জাতিসত্তা রাষ্ট্র*, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ঢাকা, বাংলা, ১৪২০

লর্ড কিনরস : দি অটোমান সেঞ্চুরিস: দ্যা রাইজ অ্যান্ড ফল অব দ্য তার্কিস এম্পারাস, (অনুবাদ: জেসি মেরী কুইয়া), ঢাকা, ২০১৪।

ইংরেজী গ্রন্থ

Halil Inaclik : *The Ottoman Empire : The Classical Age,* 1300-1600, London, 1973.

.... : *An Overview of the Ottoman state and society,* Istumbul, 1989.

M.M Muzzaoui : *The Origins of the Ottomans,* Wiesbaden, 1972.

J. Meyudoif : *The Millet System : History of Legacy* in 2 Vols.New York, 1982.

Paul Ricart : *The Rise and Fall of the Ottoman Empire*, Leiden, 1984.

Kazim Kadri : *Ziya Gokalp and Namik Kamal,* Istanbul, 1970.

Resit Kayani : *Mustafa Rashid Pasha,* Istanbul, 1962.

Thomas Goodrich : *The Ottoman Turks and the New World,* Wiesbaden, 1990.

H.A.R Gibb and
Harold Brown : *Islamic Society and the West,* Vols. 1-2, London, 1969.

Joseph R. Hacker : *Ottomanism, Turkish and Turkofication,* New York, 1982.

Abdul Kadir Ozan : *The Ottoman Conquests,* London, 1972.

Ekmeleddin Ihsanoglu : *The Ottoman Empire and the Turkish Republic,* Steiner,1985.

Mustafa Varlik : *The Ottoman Empire in the Reign of Sulayman The Magnificent,* Istumbul, 1988.

Karl Barber : *Ottoman Rule in Europe,* Princeton, 1980.

Jecob Coleman : *The Europeanization of Ottoman Diplomacy,* Princeton, 1986.

Olivier : *Ottoman Diplomacy and the European state system,* Ankara, 1992.

Z.N. Zeine : *Arab-Turkish Relation,* Beirut, 1959.

Z. Vesala : *Ottoman Rule in Central Europe and Balkan Region,*Prague, 1978.

H. Gibb : *Ottoman Emperialism,* Cambridge, 1970.

David Barchand : *A Bridge between Hemispheres Brasscy*, Oxfotd, 1986.

R.E. Ward and D.A. Ruston (ed.) : *Political Modernization inTurkey*, Princeton University Press, 1968.

Caglar Keyder : *ThePolitical Economy of Turkish Democracy,* London, 1979.

Halide Edib : *Turkey Forces West,: A Turkish View of Recent Changes and Their Origin,* Yale University Press,New Haven, 1930.

Halide Edib : *Turkey, Old and New,* New York, 1947.

Halide Edib : *Conflict of East and West in Turkey,* London, 1961.

H. Authony Salmone : *The Fall and Resurrection of Turkey,* Metheur & Co. 1986.

Lord Eversley : *The Turkish Empire,* Lahore, 1959.

Bernard Lewis : *The Emergence of Modern Turkey,* London, 1968.

Philips Price : *A History of Turkey (From Empire to Republic),* London, 1956.

Stanford J Shaw : *History of Ottoman Empire and Modern Turkey,* New York, 1976.

George Lewis : *Turkey*, London, 1965.

Toynbee & Kirkwood : *Turkey,* London, 1968.

Lord Kinross : *Ataturk, Rebirth of a Nation,* London, 1965.

Max Weston Thornburg : *Turkey,* London, 1984.

Jakob M Landan : *Ataturk and the Modernization of Turkey,* Leiden, 1984.

Selma Ekram : *Turkey Old and New,* New York, 1974.

S. Marden : *Young Ottoman Thought,* Princeton, 1962.

Edgar Hosch : *The Balkans : A Short History*, London, 1988.

Gorge Castellan : *History of the Balkans,* New York, 1992.

Donal Quatatet (ed.) : *An Economic and social History of the Ottoman Empire,* Leiden, 1994.

Peter F. Sugar : *South Eastern Europe under Ottoman Rule,* London, 1977.

L. S. Stavrians : *The Balkan States*, California, 1999.

Charles Jelavach et al : *The Establishment of the Balkan National States*, New York, 1990.

Anonymous (U.S. Air Force Officer) : *Turkism And The Soviets.*

Kamal Ataturk : *A Speech Delivered at Angora*, 15th -20th Oct. 1927. English Translation, Leipzing 1929.

E. Bisbee : *The New Turkey : Pioneers of the Republic*, 1920-1950, Philadelphia, 1951.

S. N. Fisher : *The Middle East, A History,* New York, 1960.

George M Haddad : *Revolutions and Military Rule in the Middle East : The Northern Tier*, New York, 1965.

Witz J. C Hare : *Diplomacy in the Near and Middle East : A Documentary Records* Vol. 11, Princeton, N. J.1956.

Allen E. Henry : *The Turkish Transformation : A Study in Social and Religious Developments,* Chicago, 1935.

George Kirk : *The Middle East 1945-1950*, Survey of International Affairs, Oxford University Press, 1954.

George Lenczowski : *The Middle East in World Affairs,* New York, 1962.

J. A Toynbee : *The Islamic World Since Peace Settlement,*

Survey of International Affairs, 1925 (i)

Damian Popolo : *A new Science of International Relations : odernity, Complexity and the Kosovo Conflict,* AshgatePublishing Limited, UK, 2011.

Abu Lughod, Janet : *Before European Hegemony: The World System A.D. 1250-1350.* Oxford: Oxford University Press, 1989.

Adams, Karen Ruth. : *Structural Realism: The Consequence of Great Power Politics" In Making sense of International Relations Theory,* edited by Jennifer SterlingFolker. Boulder: Lynne Rienner, 2006.

Ali, Tariq ed. : *Masters of the Universe? NATO's Balkan Crusade*. London: Verso, 2000.

Anzulovic, Branimir : *Heavenly Serbia: From Myth to Genocide*, London: Hurst, 1999.

Auerswald, David : Explaining wars of Choice: An Integrated Decision Model of NATO Policy in Kosovo, *International Studies Quarterly no. 48 (2004).*

Auerswald, Philip and David Auerswald :*The Kosovo Conflict, a Diplomatic History through Ducuments*. The Hague: Kluwer Law International, 2000.

Banac, Ivo. : *The National Question in Yogoslavia: Origins,History, Politics,* Ithaca, London: CornellUniversity Press, 1984.

Bennett, Christopher :*Yugoslavia's Bloody Collapse*. New York: New York University Press, 1995.

Boyle, Francis : *Foundations of World Order*: The Legalist Approach to International Relations (1898-1922).London and Durham: Duke University Press, 1999.

Brown, Michael : *The Causes of Internal Conflict, In Nationalism and Ethnic Conflict,* Revised Edition, edited by Michael Brown, Own Cote, Sean Lynn-Jones and Steven Miller. Cambridge: MIT Press, 2001.

Campbell, David : *National Deconstruction: Violence,Identity and Justice in Bosnia.* Minneapolis: University of Minnesota Press, 1998.

Chesterman, Simon : *Just War Just Peace? Humanitarian Intervention and International Law.* Oxford, New York: Oxford University Press, 2001.

Chomsky, Noam : *The New Military Humanism: Lessons from Kosovo.*London, Pluto Press, 1999.

Cilliers, Paul : *Complexity and Postmodernism.* London: Routledge, 1998.

Clark, Wesley : *Waging Modern War*. New York: Public Affairs, 2002.

Clemens, Walter, ed. : *In The BalticTranformed: Complexity Theory and European Security.* New York: Rowman and Littlefield Publishers, 2001.

Cochrane, Kathryn : *Kosovo Targetin: A Bureaucratic and Legal Nightmare:* Aerospace Center, June 2001.Coicaud, Jean-Marc and

Daniel Waniel

Warnereds : *Ethics and International Affairs: Extents and Limits.* Tokyo: The United Nations University Press, 2001.

Corson, Mark and

Clemson Turregano : *Spaces of unintended consequesces*: The Ground Safety Zone in Kosovo, *GeoJournal Vol.57*, no. 4 (2002).

Cosic, Dobrica : *Kosovo*.Belgrade: Nocosti, 2004.

Cox, Robert : *Approaches to World Order,* Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

Cviic, Christopher : The Serbian Exception, *International Affairs* Vol. 75, no.3 (1999).

Daalder, Ivo and

Michael O' Hanlon : *Winning Ugly: NATO's War to save Kosovo*. Washington DC: Brookings Institution Press, 2000.

De Graaff, Bob : 'The Difference Between Legal Proof and Historical Evidence: The Trial of Slobodan Milosevic and the Case of Srebrenica', *European Review* Vol. 14 (2006).

De Landa, Manuel. : *A Thousand Years of Nonlinear History*.New York: Zone Books, 1997.

Dania, Robert and John Fine : *Bosnia and Hercegovina:* A Tradition Betrayed, New York: Columbia University Press, 1994.

Eve, Raymond, Sara Horsefall and Mary Lee, eds. : *Complexity and Sociology: Myths, Models and Theories.* London: Sage Publications,1997.

……………… : *Surveiller et Punir*, Saint-Amand: Editions Fallimads, 1993.

Gaddis, John Lewis : *We Now Know: Rethinking Cold War History*, Oxford: Oxford University Press, 1997: Chapter 1, Section II.

Gheciu, Alexandra : 'International Norms, Power and the Politics of International Administration:

The Kosovo Case', *Geopolitics* Vol. 10, no.1 (2005).

Glennon, Michael : *Limits of Law, Prerogatives of Power: Intervention After Kosovo,* New York: Palgrace, 2001.

Gorman, Anthony : Whither the Broken Middle? Rose and Fackenheim of Mourning, Modernity and the Holocaus, *in Social Theory after the Holocaust*, edited by Robert Fine and Charles Turner. Liverpool: Liverpool University Press, 2000.

Gow, James. : *The Serbian Project and Its Adversarie: A Strategy of War Crimes*, London: Hurst and Co. Publishers, 2003.

Harrison, Ewan : 'Waltz, Kant and Systemic Approaches to International Relations', *Review of International Studies* Vol. 28, no. 1, (2002).

House of Commons : Foreign Affairs Commitee, Fourteenth Report, Kosovo, Vol.II Minutes of Evidenceand Appendices, 24 May 2000, p. 97.Examination of withness: Judah, Sweeney and Roberts.

House of Commons : Foreign Affairs Commitee, “FourtReport:, Kosovo. Vol. I Report and Proceedings of the Committee”, 23 May 2000.

Human Rights Watch : Under Orders: War Crimes in Kosovo-3, Forces in the Conflict.

Huntington, Samuel : *The Clash of Civilizations and the Remaking of Wolrd Order*, New York, Simon and Shuster,1998.

Ignatieff, Michael : Virtual War*: Kosovo and Beyond*, London, Chatto and Windus, 2000.

Independent International Commission on Kosovo *: The Kosovo Report: Conflict, International Response, Lessons Learned*, Oxford: Oxford University Press, 2000.

International Court of Justice : “Decision by the International Court of Justice on the Case Concerning the Legality of Use of Force *Yogoslavia v United States of America*, 2 June 1999”. In *The Kosovo Conflict, a Diplomatic History through Documents,* edited

by Philip Auerswald and David Auerswald, The Hague:Kluwer Law International, 2000.

International Court of Justice : "Dissenting opinion of Judge Kreca". The Hague.

International CriminalTribunal For the Former Yugoslavia (ICTY): "Final Report to the Prosecutor Bythe Committee Established to Review the NATO Bombing Campaign Against the Federal Republic of Yugoslavia".

Joffe, Natasha : 'At War with NATO, *The Guardian* (Manchester), 23 October 2001.

Judah, Tim. Kosovo : *War and Revenge*. London, New Haven: Yale University Press, 2000.

Keeley, James : 'Towards a Foucauldian Analysis of International Regimes', *International Organization* Vol. 44, no.I (16999).

New World Disorder : 'The ill-considered war in Kosovo has undermined relations with China and

Russia and put NATO at risk',
Newsweek
(31 May 1999).

Kola, Paulin : *The Search for the Greater Albania.* London, Hurst, 2003.

Kolossov, Vladimir : Border Studies: Changing Perspectives and Theoretical Approaches, *Geopolitics* Vol. 10, no. 4 (2005).

Krisch, Nico : 'Legality, Morality and the Dilemma of Humanitarian Intervention After Kosovo' *European Journal of International Law* Vol. 13, no. 1 (2002).

Littman, Mark : *Kosovo:Law and Diplomacy*, Paper Publishedby Chameleon Press,Centre for Policy Studies, November 1999.

Malcom, Noel : *Kosovo: A Short History*. Basingstoke: Macmillan, 1998.

Martin, Pierre and Mark Brawley : Alliance *Politics, Kosovo and NATO's War: Alliance or Forced Allies*? London: Palgrave, 2001.

Meirik, Karen : Controversial Srebenica Report Back on Table, The Institute for Peace and War Reporting, 6 February 2004:

Mertus, Julie : *Kosovo: How Myths and Truths Started a War*. London, Berkeley: University of California Press, 1999.

Norton-Taylor, Richard : 'Serb TV Station was Legitimate Target, says Blair', *The Guardian* (Manchester), 24 April 1999.

O'Tuathail : Gearoid and Carl Dahlman,The Clash of Govern mentalities, Displacement and Return in Bosnia Herzegovina. In *Global Governmentality:Governing International Spaces* edited by Wendy Larnerand William Walters. London: Routledge, 2004.

Owen, David : *Balkan Odyssey*. New York: Harcourt Brace, 1995.

Petrovic, Edit : Ethno nationalism and the Dissolution of Yugoslavia, in *Neighbors at War: Anthropological Perspectives on Yugoslav Ethnicity, Culture and History,* edited by Joel Martin Halpern and David Kideekedl. Penn: Penn State Press, 2000.

Worldviews : *Science and Us*, edited by Carlos Gershenson. London: World Scientific, 2007.

Popov, Nebojsa : The *Road to War in Serbia: Trauma and Catharsis*, Budapest: Central University Press, 2000.

Vjeran Pavlakovic : *Servia Since 1989: Politics and Society under Milosevic and After*. Washington, University of Washington Press, 2005.

Romijn, Peter and JCH Blom : *Srebrenica: A Safe Area. Reconstruction,Background Consequences and Analyses of the Fallof the Safe Area*. Amsterdam: Netherlands Institute for War Documentation, 2002. Schnabel,

Albrecht and Ramesh Thakur eds : *Kosovo and the Challenge of Humanitarian Intervention: Elective Indignation, Collective Action, and International Citizenship*, Tokyo: United Nations Press, 2000.

SEkelj, Laslo : *Yugoslavia: The Process of Disintegration*. Highland Lakes: Atlantic Research and Publications, 1992.

Sell, Louis : *Slobodan Milosevic and the Destruction of Yugoslavia*. Durham: Duke University Press, 2003.

Smith, Martin : *The Kosovo Crisis and the Evolution of Post Cold War European Security*. Manchester, Manchester University Press, 2003.

Smith, Steve : Positivism and Beyond, in *International TheoryPositivism and Beyond*, edited by Ken Booth, Steve Smith and Marysia Zalewski. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

Strauss, Julian : Military 'Death Squads, Behind Kosovo Massacre*Daily Telegraph*, 27 January 1999.

Thomas, Robert : *Serbia under Milosevic*. London: Hurst and Co. Publishers, 1999.

Van Ham : Peter and Sergei Medvedev*, Mapping European Security After Kosovo.* Manchester: Manchester University Press, 2002.

Veremis, Thanos and Evangelos Kofos : *Kosovo, Avoiding another Balkan War.* Athens: Hellenic Foundation for EuropeanForeign Policy and University of Athens,1998.

Vickers, Miranda : *Between Serbs and Albanians: A History Of Koso,* .London; Hurst, 1998.

Waller, Michael : Kyril Drezov and Bulent Gokay. *Kosovo, ThePolitics of Delusion.* London, ortland: Frank cass, 2001.

Keohane : New York: Columbia University Press, 1986.

Man :*The State, and War: A Theoretical Analysis*.New York: Columbia University Press, 2001.

Weller, Marc : The *Crisis in Kosovo 1989-1999: from the Dissolution of Yugoslavia to Rambouillet and the Outbreak of Hostilities. Cambridge*, Documents

and Analysis Publishing, 1999.

F.e. Ian Hamilton : YUGOSLAVIA: *Patterns of Economic* Activity, London, 1968.

P. Auty : *Yugoslavia*, London, 1964; New York, 1965.

Ivan, Avsenek : *Yugoslavia - A Multinational State,* San Francisco, 1966.

G Jelavich : *The Balkans in Transition*, Berkley, 1963.

Marion. Newbigin : *The Geographical Background to Balkan Problems*, London, 1916.

Bruce McFarlane : *Yugoslavia, Politics, Economics and Society*, London and New York, 1988.

Fred Singleton : *A Short History of the Yugoslavia Peoples*,London, 1985.

Bernard lewis :*The Emergence of Modern Turkey*, London:Oxford University Press, 1961.

Walter F. Weiker, : *The Turkish Revolution,* 1960-1961, Washington, D.C: Booking Institution, 1964.

A.L.Macfie : *Ataturk*, London and New York, longmans, 1994.

Feroz Ahmad : *The Making of Modern Turkey*, London and New York, 1990.

Jacob M landaw : *Ataturk and the Modernization of Turkey*, London, 1984.

Roderic H Davison : *Turkey : The Modern Nations in Historical* Perspective, New Jursey, 1968.

M. Sukru Hamioghi : *A Brief History of the late Ottoman History*, Princton: University Press, 2014.

M.S Anderson : *The Eastern Question* 1774-1926, London, 1966.

Chris Topher E. Haove, Colonel, USAF and Phil M. Houn :A-los Over Colonel USAF Kosovo: *The Victory of Airpower over a fielded army as told by the Airmen who fought in operation allied Force*. Air University Press, Mocwell Air Force Base, Alabana, December 2003.

Howard Clark : *Civil Resistance in Kosovo*, London, 2000.

D. Batakovic : The Kosovo Chronicles: Belgrade, 1992.

G.Duij Zings, D Janjic and

S Maliqi (eds) : *Kosovo- Kosovo: Confrontation or Co-existance,* University of Nijmegen Peace Research Centre, 1997.

M. Glenny : *The Fall of Yugoslavia*, Harnaods worth, peaguin, 1992

D. Janjic and S.maliq: (eds) : Conflict or Dialogue, Serbian-Albanian Relations and integration of the Balkans, *Studies and Essays,* European Civic Centre for Conflict Resolution, 1994.

N. Malcon, Kosovo : *A Short History*, London, Macmillan/ New York, University Press, 1998.

J. Mertus, Kosovo : *How Myths and truths started a war,* Berkley, University of California Press, 1999.

S Maliqi : *Kosovo: Separate Worlds-Reflections and Analysis*, Pristina,1998.

M. Motes : *Kosovo-Kosovo: Prelude to war, 1966-*

1999, Homestead, FI Redland Press, 1999.

A. Pipa, and
S. Repishti : *Studies on Kosovo*,New York, 1984.

H Poulton and
Sha Tagi Farkouki (eds) : *Muslim Identity and the Balkan State*, London, 1997.

S. Troebst : *Conflict in Kosovo: Failure of Prevention an Analytical Docmentation,* 1992-1998 Flensburg : European Centre for Minority issues, 1998.

M.Vickers : *Between Serb and Albanian: A History of Kosovo,* London, 1998.

.... : Constitution of the Republic in Kosovo.

Noel Malcolm : *Kosovo: A Short History*, New York, 1998.

Stefan lehne : *Kosovo and Serbia: Toward a normal Relationship,* March 2012.

Will Bartleff and
Vasilis Monastiriotis (eds) : *South East Europe after the Economic Crisis: a New Down or back to business as usual LSE Reprographics Department,* November, 2010.

Armend R. Bekaj : *The KLA and the Kosovo war from Intra-state Conflict to Independent Country,* Berlin, Germany, 2010.

বাংলা সাময়িকী / সংবাদপত্র

ইতিহাস, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ঢাকা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ঢাকা।

সামাজিক বিজ্ঞান পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

নিবন্ধমালা, উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রবন্ধাবলী, সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

নিরীক্া, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা কেন্দ্রের মুখপাত্র।

ইংরেজী সাময়িকীঃ

The Dhaka University Studies.

Rajshahi University Studies, Part-A, Vol-27, 1999.

CDHRF Weekly, Monthly and Quarterly Bulletins (Council for Defense)

of B Ituman Rights and Freedoms, Pristina.

DKLC Daily(Cokosova Information Centre, Prishtina).

Kosovo Communication (bulletin of Ministry of Information of Republic of Kosovo, London, Kosovo Information Centre, 1992-99

Stefon Troebst, Conflict in Kosovo: Failure of Prevention?

European Centre for Minority Issues, May, 1998

Aleksa Djilas, æKosovo's Ancient Hatreds," Foreign Affairs, Volume 77, Number 5, September/October 1998

Michael Ignatieff,"The Dream of Albanians" The New Pooker, 11 January 1999, pp.34-39.

International Crisis Group, æIntermediate Sovereignty as a Basis for Resolving the Kosovo Crisis" 9 November 1998.

International Crisis Group, æKosovo spring” 20 March 1998.

Amnesty International, Yugoslavia: Recent Events in the Autonomous Provinces of Kosovo (1989)

European Parliament, æResolution on the situation in Kosovo of 12 March 1998” official Journal of the European Communities c 104, 6 April 1998, pp. 216-217.

Janusz Bugajskj, æThe Case for an Independent Kosovo” Christian Science Monitor 19 August 1998.

Us Department of Defense Bosnia Task force Briefing, 9 September 1998 and Pentagon Briefing 10 September 1998.

Kosovo Daily Report 1481, 5 July 1998.

ওয়েব সাইট

http://en.www.assembly-kosova.org

http//:en.wikipedia.org/wiki/Slobodan,Milosevia

www.antiwar.com

http://en.wikiquote.org/wiki/Richad_Holbrooke

http://amaton.co.uk/Slodier-Autobiography

http://en.wikipedia.org/wiki/International_recognation_of_Kosovo

http://en.www.thegurdian.com/world/1999/Aug/02/balkans3

http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Kosovo

http://enwikipedia.org/wiki/President_of_Serbia

http://en.www.assembly-kosova.org

http://en.wikipedia.org/wiki/slobodan,Milosevia

www.antiwar.com

http://en.wikiquote.org/Richad_Holbrooke

http://amaton.co.uk/Slodier-Autobiography

http://en.wikipedia.org/wiki/International_recognation_of_Kosovo

http://www.aimpress.ch

http://www.crisis web.org/projects/sbalkous/reports

http://listserv.acsu.buffalo.edu/archivas/albannews.html